১৩ আগস্ট স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান দিবস

কেন্দ্রীয় সমাবেশ থেকে ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করার আহ্বান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত শ্রমিক- কর্মচারী আন্দোলন তার দীর্ঘ পথচলায় কখনই কোন শাসকের রক্তচক্ষুর সামনে মাথা নত করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না, ১৯৫৬ সাল থেকে কর্মচারী আন্দোলনের সুদীর্ঘ পথচলার ক্ষেত্রে বহু বাধা-বিপত্তি, চড়াই-উৎরাই, আক্রমণ যেমন সামনে এসেছে তেমনি এর বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পশ্চিমবাংলার কর্মচারী আন্দোলন একের পর এক দাবি-আদায়ে সাফল্য অর্জন করেছে। ইতিপূর্বেও বহু ক্ষেত্রে প্রশাসনের শীর্ষ ব্যক্তিরা আমাদের সকলের প্রিয় সংগঠন রাজ্য-কো অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙ্গে দেওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন, বহু নেতৃত্বকে বরখাস্ত, দূর-দূরান্তে বদলী করা হয়েছে নির্বিচারে কিন্তু সংগঠনকে ভাঙ্গা যায়নি, পুরোনো নেতৃবৃন্দের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে সংগঠন আরও শক্তিশালী হয়েছে আর যারা এগুলি করতে চেয়েছিলেন তারাই পশ্চিমবাংলার শ্রমজীবী জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। বর্তমান রাজ্য সরকারের চার বছর সময়কালে রাজ্যের জনসাধারণের অধিকারের সঙ্গে রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত সমস্ত স্তরের শ্রমিক-কর্মচারী এবং শিক্ষাকর্মীদের শিক্ষক-কষ্টার্জিত গণতান্ত্রিক, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসমূহ আজ ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রান্ত। সরকারী আদেশনামা জারি করে সভা-সমিতি, বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সংগঠিত প্রতিবাদকে নস্যাৎ করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে

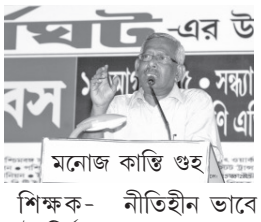
মনোজ কান্তি গুহ

হয়রানিমূলক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সংগঠনের কর্মী-নেতা-সাধারণ কর্মচারীদের নীতিহীন ভাবে নির্বিচারে বদলী করা হচ্ছে। এত আক্রমণের পরেও যখন পশ্চিমবাংলার কর্মচারী আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যাচ্ছে না, আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে কর্মচারীর ক্ষোভকে বন্ধ করা যাচ্ছে না, তখন পশ্চিমবাংলার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অনুগত কর্মচারী সংগঠনের সভায় প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভেঙ্গে দেওয়ার। কিন্তু দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মতাদর্শের ছাত্র হিসাবে আমরা জানি ইতিহাস শ্রমজীবী জনগণের দ্বারাই রচিত হয় ,অত্যাচারী শেষ কথা বলেনা। তাই সংগঠনকে ভেঙ্গে দেওয়ার আহ্বানের পরবর্তী ইতিহাস এটাই যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে ৩৫টি সংগঠন আজ ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই সংগ্রামে শামিল। বিগত ৯ জুলাই ২০১৫ মৌলালী যুবকেন্দ্রে ২১টি সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে বর্তমান রাজ্য সরকারের সীমাহীন আর্থিক বঞ্চনা সহ ৯ দফা দাবিতে আগামী ২ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ধর্মঘট এ শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, পরবর্তীতে আরও সংগঠন যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে বর্তমানে ৩৫টি সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে রাজ্যের মুখ্যসচিবের নিকট ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করেছে, যা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ঘটনা—কলকাতায় রানী রাসমণি রোডের সুবিশাল

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে)

উৎপল রায়

সমর চক্রবর্তী

অসিত সরকার

দীপঙ্কর বাগচী

বলাই মিত্র

শুভাশীষ দাস

অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য

মলয় মুখার্জী

দীপক রায়চৌধুরী

ভাস্বতী মুখার্জী

কপালি কাবাসী

রেখা গোস্বামী

সুবর্ণ জয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে

১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিপালিত

গত ২৩ জুলাই, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চে, ১২ই জুলাই কমিটির ৫০ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এক কর্মী সভার আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে শোক প্রস্তাব পাঠের পর প্রারম্ভিক বক্তব্যে কমিটি গঠনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তার ৪৯ বছরের ইতিহাস ব্যক্ত করে প্রস্তাব পেশ করেন ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক সমীর ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ১৯৬৬ সালে কমিটি গঠনের যে ঘটনা, তা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রয়াত জননেতা কমরেড জ্যোতি বসুও তাঁর বিভিন্ন লেখায় এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রকৃত অর্থেই ১২ই জুলাই কমিটি, ৫০ বছর ধরে সমস্ত রকম গণ আন্দোলনের সাথে এবং কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলির নিজস্ব দাবি দাওয়া মূলক কর্মসূচীতে, কমিটির যে দায়িত্ব, তা পালন করে এসেছে। আজ, যখন শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে আরো

বাসুদেব আচারিয়া

সুদৃঢ় করার সময় এসেছে তখন কমিটি তার সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর ভাবে শ্রমজীবী মানুষের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে কেন্দ্রীয় সরকার। নয়া উদারবাদী নীতি প্রণয়ন করার জন্য যাবতীয় স্বৈরাচারী কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। সংসদকে উপেক্ষা করে পরপর অর্ডিনান্স জারি করে যাচ্ছে তারা। অন্যদিকে সারা দেশে আক্রান্ত শ্রমজীবী মানুষও ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, প্রতিরোধ করছেন। রাজ্যের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ছে। তাই আজ রাজ্যের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করাই আশু দায়িত্ব। শুধু রাজনৈতিক কর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীই নয়, এমন কোন মানুষ নেই যিনি বর্তমান সরকার তথা শাসক দলের দ্বারা আক্রান্ত নন। তাই এর প্রতিবাদ তথা প্রতিরোধ করতে গেলে, আগামী প্রতিটি কর্মসূচীকে আমাদের সামগ্রিক ভাবে সফল করতে হবে। রাজ্য ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আগামী ২ সেপ্টেম্বর যে ধর্মঘটের কর্মসূচী নিয়েছে তা আমাদের এই মুহূর্তে আশু কর্মসূচী রূপে বিবেচিত হবে। এই পরিস্থিতিতে সারা বছর ধরে ১২ই জুলাই কমিটির ৫০ বছর পূর্তির যে কর্মসূচী পালিত হবে তা হবে সংগ্রাম তথা আন্দোলনের কর্মসূচী। ১২ই জুলাই কমিটি সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে যেমন এর প্রস্তুতি শুরু করেছে, পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের নিজের আন্দোলনের কর্মসূচী তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে রাজ্য সরকার থেকে তাদের প্রাপ্য বকেয়া ও প্রাপ্ত অধিকার আদায়ের জন্য ধর্মঘটে যাচ্ছে। সেই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে আজকের সভা থেকে ধর্মঘটকে সফল করার শপথ নিতে হবে আমাদের।

১২ই জুলাই কমিটির অপর যুগ্ম আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট নয়, পরিস্থিতি পাল্টানোরও আজ সময় এসেছে। আর এই পাল্টানোর কথা মাথায় রেখেই এই প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এই ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতা সহ জেলায় জেলায় এই কর্মসূচী প্রতি পালিত হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় কমিটির প্রতিষ্ঠাতাদের স্মরণে রক্তদান কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে যখন ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে, ঠিক তার আগে, রাজ্যে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ

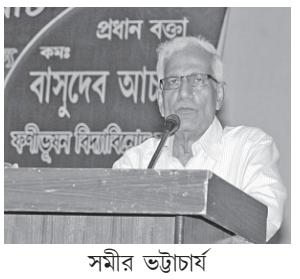

সমীর ভট্টাচার্য

বিধানসভা নির্বাচনও সংগঠিত হবে। আমরা চাই যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নৈরাজ্যের শক্তিকে পরাজিত করে জনগণের পক্ষে সরকার, আমাদের অভিজ্ঞতায় যারা পরীক্ষিত সরকার, সেই সরকারকে আমাদের প্রতিষ্ঠা করার যে লড়াই, তাতে আমাদের কর্তব্য পালন করতে হবে। আগামী জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিকে নিয়ে কলকাতায় এক বিশাল সমাবেশের কর্মসূচী নেওয়া হবে। রাজ্য সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত

(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
আগস্ট ২০১৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৪ তম বর্ষ □ চতুর্থ সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

এনাফ ইজ এনাফ

এনাফ ইজ এনাফ— ইংরাজী ভাষায় চূড়ান্ত হতাশা, বিরক্তি বা ক্ষোভের অভিব্যক্তি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই শব্দবন্ধটি সোস্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ে অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত গণ বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছিল মিশরের তাহরির স্কোয়ারে। 'এনাফ ইজ এনাফ' হয়ে উঠেছিল স্বৈরতন্ত্র বিরোধী দুর্বার আন্দোলনের কয়েনেজ।

হঠাৎ করে এই প্রসঙ্গের অবতারণার কারণ হলো আমাদের রাজ্যেও বর্তমানে এমনই এক নৈরাজ্যবাদী পরিস্থিতি বিরাজ করছে। হাতে গোনা কয়েকজন 'কেষ্ট-বিষ্টু' ছাড়া আম-জনতার প্রায় সকলেই নিজেদের জীবন-জীবিকার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছেন, বর্তমানে রাজ্যে যা চলছে তাকে সভ্য প্রশাসন না বলে জঙ্গলের রাজত্ব বলাই শ্রেয়। যেখানে সাংবিধানিক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কিছু ব্যক্তি এবং তাদের রাজনৈতিক সহচরেরা হলো খাদক এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ সহ সাধারণ মানুষ হলেন খাদ্য। আর খাদকের উদরপূর্তির আয়োজনই হলো এই জঙ্গলের রাজত্বের একমাত্র অঘোষিত-অলিখিত আইন।

রাজ্যের বর্তমান শাসক দল ও তাদের শাসন প্রণালি সম্পর্কে উপরোক্ত উপমা সহ ব্যাখ্যাটি খুব বেমানান মনে হয় কি? অবশ্য বেমানান এক অর্থে মনে হতে পারে যে, জঙ্গলের রাজত্ব বললেও রাজ্যের বর্তমান বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সবটা বলা হয় না। জঙ্গলে অন্তত দিনেরবেলায় ডালপালার ফাঁক দিয়ে সামান্য হলেও সূর্যের আলো ঢোকে। অথচ পশ্চিমবাংলায় আজ সেটুকু আলোরও বড়ই অভাব। এক ঘোর অমানিশা আজকের পশ্চিমবাংলার মুখ ঢেকে রেখেছে। এখন প্রশ্ন কেন এমন হলো? বিশেষত যে পশ্চিমবাংলায় মানুষের উন্নত রাজনৈতিক চেতনা, গণতন্ত্রের শক্তিশালী ভিত, সম্প্রীতির বাতাবরণ দীর্ঘদিন ধরেই এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে সারা দেশে স্বীকৃত ছিল। সেই পশ্চিমবাংলার এমন কদাকার পরিণতির কারণ নিয়ে চর্চা তো জরুরী বটেই। কিন্তু, সম্ভবত আরো বেশি জরুরী সম্মিলিত আত্মজিজ্ঞাসা। কেন এমন হলো নিয়ে তো আলোচনা চলছেই। কিন্তু কেন এমন হতে দেওয়া হলো তা নিয়ে আলোচনাটা আরো বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কারণ গণতন্ত্রে কোনো পরিবর্তনের ফল যদি বিষময় হয়, তাহলে তার দায় আমরা সাধারণ মানুষ এড়াতে পারি না। সম্মিলিত ভোটাধিকারের কোদাল দিয়ে খাল কাটার কাজটা আমরাই করেছিলাম। কুমিরকে সুযোগ করে দিলে, তার যা কাজ তা সে করবেই।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'পরিবর্তন' কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। মানুষের ভোটে নির্বাচিত সরকার যদি মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম না হয় বা অন্তত সচেষ্ট না হয়, তাহলে বিকল্পের সন্ধান করা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। আমাদের দেশে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে রাজ্যে এমন ঘটনা বহু ঘটেছে। তবু প্রথমদিকে বিকল্প সন্ধানের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। বিশেষত কেন্দ্রে এবং ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও (ব্যতিক্রম কেরালা যেখানে পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে বিকল্পের সন্ধান মানুষ পেয়েছিল)। কেন্দ্রে মানুষ বিকল্পের খোঁজ পায় সত্তরের দশকের শেষ পর্বে। তারপর কেন্দ্রেও ঘন ঘন পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্র বা বিভিন্ন রাজ্যে সরকারের ঘন ঘন পরিবর্তনে মানুষের কার্যত কোনো লাভ হয় নি। কারণ সরকারের পরিবর্তন হলেও, সব মানুষের সব সময়ের জন্য ভালো হয় তেমন নীতি কোন সরকারই গ্রহণ করেনি। ফলে ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি মানুষকে বার বার আশান্বিত করেছে, কিন্তু আশাভঙ্গও হয়েছে অচিরেই। কেন্দ্রে সাম্প্রতিকতম পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

দেশব্যাপী কেন্দ্র ও রাজ্যে রাজ্যে সরকার গঠনকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে আশা-নিরাশার যে দোলাচল দীর্ঘদিন ধরেই চলছে, তার মধ্যে অতি অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিল তিনটি রাজ্য— কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা। ব্যতিক্রম কারণ এখানে মানুষ বিকল্প হিসেবে বামপন্থীদের পেয়েছে, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী, নীতি ও আদর্শগত অবস্থান আর সব রাজনৈতিক দলের থেকে একেবারেই আলাদা। খুব গূঢ় রাজনৈতিক বিশ্লেষণে না ঢুকে এক কথায় বলা যায়, আর সব দল জনকল্যাণের কথা মুখে বললেও, মূল লক্ষ্য থাকে কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের ভালো করা। আর বামপন্থীদের অবস্থান ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ প্রকৃত জনকল্যাণে নীতি প্রণয়নই তাঁদের লক্ষ্য। তবে রাজ্যস্তরে এই কাজ তাঁদের করতে হয় বিপুল সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে। কারণ আমাদের দেশের সংবিধান প্রথম থেকেই কেন্দ্রিকতার দোষে কিছুটা দুষ্ট। অর্থাৎ আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তা গড়ে তোলার পথ আমাদের সংবিধান দেখায়নি। আবার যতটুকু অধিকার শুরুতে রাজ্যগুলির ছিল, পরবর্তী পর্বে কেন্দ্রের হাত শক্ত করার জন্য তাও অনেকাংশে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতেই বামপন্থীদের তিনটি রাজ্যে সরকার পরিচালনা করতে হয়েছে বা হচ্ছে। এই একই সমস্যা অন্যান্য রাজনৈতিক দল পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলির ক্ষেত্রে থাকলেও, বামপন্থীদের অতিরিক্ত যে প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়েছে তা হলো, রাজনৈতিক বৈরিতা থেকে উদ্ভূত চূড়ান্ত অসহযোগিতা ও বিমাতৃসুলভ আচরণ।

এতদসত্ত্বেও পশ্চিমবাংলায় টানা চৌত্রিশ বছর বামপন্থীরা সরকার পরিচালনা করতে পেরেছিল কেন? এই রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব কি ছিল না? হ্যাঁ ছিল এবং অন্তত প্রাপ্ত ভোটের হারের নিরিখে বলা যায়, প্রবলভাবেই ছিল। তবুও মানুষ, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বামবিরোধী শক্তিকে দীর্ঘদিন ক্ষমতার মসনদ থেকে দূরে রেখেছিল। এই পৌনঃপুনিক প্রত্যাখ্যান কোনো নেতিবাচক গণ মানসিকতার প্রতিফলন ছিল না। ছিল এক ইতিবাচক রাজনৈতিক চেতনার পরিচায়ক। বামপন্থীদের সমগ্র কর্মকাণ্ড দাঁড়িয়েছিল দুটি স্তম্ভের ওপর যা মানুষকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করেছিল— (১) কথা ও কাজের মধ্যে কোনো ফাঁক না রাখার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং (২) সমাজের সমস্ত ব্রাত্য অংশকে সসম্মানে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা ও প্রতিষ্ঠিত করার জঙ্গি কর্মসূচী। মানুষের সাথে বামপন্থীদের অটুট নৈকট্যকে বহু চেষ্টা করেও দীর্ঘদিন ফাটল ধরাতে পারেনি বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি।

কিন্তু একটা সময় তারা পারল। কেন তারা অবশেষে সফল হল তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। বহু কারণের মধ্যে যে দু-একটি কারণকে খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায় তা হল— (১) বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির সফল মরিয়া উদ্যোগ ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত ও আক্রমণাত্মক। কারণ এবারের প্রচেষ্টা শুধুমাত্র রাজ্য সরকারের পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বামপন্থীদের শক্তিকে জাতীয় রাজনীতিতে দুর্বল করাই ছিল মূল লক্ষ্য। (২) বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমের সংগঠিত বিপুল শক্তিশালী প্রচার জনমানসকে নিদারুণ প্রভাবিত করেছে। মানুষের অভিজ্ঞতা হয়ে পড়েছে গৌণ। গণমাধ্যমই জনমত ম্যানুফ্যাকচার (সৌজন্যে নোয়াম চমস্কি) করেছে এবং (৩) কথা ও কাজের ফাঁক না রাখার যে বৈশিষ্ট্য বামপন্থীদের আর সকলের থেকে পৃথক স্থানে বসিয়েছিল তাও জায়গায় জায়গায় দুর্বল হয়েছে।

এই সবকিছু মিলেমিশে এমন এক উত্তপ্ত-বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি করেছিল যে, বামপন্থীদের বিকল্প হিসাবে যাদের প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে তারা আদৌ সরকার পরিচালনার ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পন্ন কিনা তা ভেবে দেখার সময় সাধারণ মানুষ পাননি। বা বলা ভালো ভাবার সুযোগ দেওয়া হয়নি। অন্যান্য রাজ্যে বা কেন্দ্রে এই সময়কালে যে পরিবর্তন হয়েছে, তা ভালো হল না মন্দ এইভাবে বিচার করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে যে পরিবর্তনকে সম্মিলিতভাবে ডেকে আনা হলো তার ফলাফলকে ভাল-মন্দর ন্যূনতম মাপকাঠিতেও বিচার করার কোনো সুযোগ নেই। কারণ সাধারণভাবে যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলে একটি গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক দল হিসেবে অভিহিত করা যায়, পশ্চিমবাংলার বর্তমান শাসক দলের সেই গুণাবলীটুকুও নেই। একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অনর্গল মিথ্যাচারী ও কপটতায় পটু ব্যক্তিকে ঘিরে কিছু সমাজবিরোধী জড়ো হলে তাদের রাজনৈতিক দল বলা যায় কি? আর এমন এক গোষ্ঠীর হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা গেলে, যা হবার, তা-ই হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়। সমাজবিরোধীদের দেখে পুলিশ পালাচ্ছে, ত্রাণ শিবিরে আশ্রিতা ধর্ষিত হচ্ছেন, কলেজে ছাত্রকে পিটিয়ে খুন করা হচ্ছে, অধ্যাপক থেকে চিকিৎসক—কলারে হাত পড়েছে সকলের। এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করার জন্য 'মাৎস্যন্যায়' কথাটাও যথেষ্ট নয়। সব অংশের মানুষের (রাজ্য কর্মচারী সহ) জীবন-জীবিকার বিপন্নতা সেতো রয়েছেই। এখনও কি সময় আসেনি একটু গা ঝাড়া দিয়ে চিৎকার করে বলে ওটা 'এনাফ ইজ এনাফ'। আর কবে দাঁড়াব আমরা? রাজ্যটা সম্পূর্ণ রসাতলে চলে গেলে?

সোস্যাল নেটওয়ার্ক তাহরির স্কোয়ারে স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, আমাদের রাজ্যে ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট তেমনটা করতে পারে না? এনাফ ইজ এনাফ বলে সবকিছুকে স্তব্ধ করে দেওয়া! □

২৫ আগস্ট, ২০১৫

বিলাত ফেরৎ

ঔপনিবেশিক আমলে 'বিলাত ফেরৎ' কথাটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করিত। 'চিকিৎসা বিজ্ঞান', 'আইনশাস্ত্র' প্রভৃতি বিষয়ে উন্নততর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বিলাত যাত্রা তৎকালীন মেধাবী ছাত্রগণের স্বপ্ন ছিল বলা যাইতেই পারে। অবশ্য শুধু মেধাবী হইলেই স্বপ্নপূরণ হইত না। একইসাথে রেস্ত-র জোর থাকাও আবশ্যিক ছিল। বিলাতী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি এই আকর্ষণ জাতীয়তাবাদী ভাবনার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নাই। এমনকি বিলাতী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আন্তর্জাতিক ভাবনায় সমৃদ্ধ হইয়াছেন এমন বহু উদাহরণও রহিয়াছে। সে যাহাই ইউক, বিলাত ফেরৎ বিশেষণটি ওজনদার ছিল নিঃসন্দেহে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্বে ব্রিটিশ সিংহের গরিমা অনেকাংশেই লুপ্ত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষ উপনিবেশবাদী নীতিরও পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পুঁজিবাদ শিরোমণি রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বর্তমান সময়েও মার্কিন আধিপত্য অব্যাহত ও নিরঙ্কুশ রহিয়াছে, পরিবর্তিত প্রকরণ সহ (যাহা নয়া উপনিবেশবাদী কৌশল রূপে স্বীকৃত)। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিবিধ শাখায় মার্কিন শ্রেষ্ঠত্বও প্রশ্নাতীত। স্বভাবতই বর্তমান সময়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীগণ উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণাধর্মী জ্ঞানার্জন এবং পেশার তাগিদে মার্কিন মুলুকে যাইতে অধিক আগ্রহী। ইংল্যান্ড তথা বিলাতে যে কেহই যাইতেছেন না, তাহা নয়। কিন্তু মার্কিন দেশ অভিমুখে প্রবাহিত মেধার স্রোত বহুলাংশে প্রবলতর। স্বভাবতই 'বিলাত ফেরৎ' শব্দবন্ধটি অনেকাংশেই 'ঔজ্জ্বল্য' হারাইয়াছে।

এতদ্ সত্ত্বেও ব্যক্তি বিশেষের 'বিলাত'-এর প্রতি দুর্বলতা থাকিলে তাহা অপরাধ রূপে বিবেচিত হইবার কোন কারণ নাই। এমন কি তাহা অস্বাভাবিকও নহে। মদীয় রাজ্যে সম্প্রতি এমনই এক বিলাত প্রেমীর সন্ধান আমরা পাইয়াছি। যাঁহার স্বপ্ন হইল কলিকাতা শহরকে লন্ডনে রূপান্তরিত করা। ইহার নির্গলিতার্থ নিশ্চিতরূপেই কলিকাতা শহরের আধুনিকীকরণ। কেন কলিকাতার আধুনিকীকরণ করিতে হইলে লন্ডনকেই অনুকরণ করিতে হইবে, কলিকাতাকে কলিকাতাতে রাখিয়াই আধুনিকীকরণে বাধা কোথায় বা আধুনিকীকরণের সর্বোচ্চ মাপকাঠি রূপে কেন নিউইর্য়ক বা টোকিও বিবেচিত না হইয়া লন্ডনই বিবেচিত হইল ইত্যাদি অমূলক প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া আমরা শুধুমাত্র সদ্ ইচ্ছাটিকে গুরুত্ব প্রদান করিতে পারি। এবং তাহার ভিত্তিতে বিগত চতুর্বৎসরে লন্ডন অভিমুখে কলিকাতা কতদূর অগ্রসর হইল তাহাও বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সম্প্রতি প্রবল বর্ষণে কলিকাতা শহরের বিভিন্ন রাজপথ বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়ের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল দেখিয়া স্বভাব নিন্দুক শহরবাসী যখন লন্ডন স্বপ্নকে নিন্দা-মন্দ করিতেছে, তখনই আমরা জ্ঞাত হইলাম যে শহরবাসীর বিচারবুদ্ধি নিম্নমানের এবং দুর্বল। কারণ কলিকাতা কেবলমাত্র লন্ডন অভিমুখে অগ্রসর হয় নাই, ইতোমধ্যে লন্ডনের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়াছে। প্রমাণ হইল, গঙ্গা-নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যেমন স্তূপীকৃত জঞ্জাল দেখিতে আমরা অভ্যস্ত, তেমনই সম্প্রতি লন্ডন প্রেমী আবিষ্কার করিয়াছেন টেমস তীরও জঞ্জাল মুক্ত নহে। ইউরেকা! ইউরেকা! কলিকাতা ও লন্ডন অকৃত্রিম জঞ্জাল বন্ধনে আবদ্ধ।

বিলাতি প্রেমের এখানেই যতি পড়ে নাই। বিলাত হইতে শিল্পকে আহ্বান করিবার জন্য তিনি সপারিষদ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা অমূলক প্রশ্ন যে তাঁহার পারিষদবর্গে কেন শিল্পপতিদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য, শিল্পের সাথে সম্পর্ক নাই এমন ব্যক্তিগণই কেনই বা ভীড় জমাইয়াছিলেন? কারণ যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের সাথেই শিল্পের কোন না কোন সম্পর্ক রহিয়াছে। ছিলেন অভিনেতাগণ, যাঁহাদের নৃত্যগীতি ও অভিনয় প্রতিভা তো শিল্পেরই অন্তর্ভুক্ত (সৌজন্যে মহামানবীর কথাঞ্জলি)। ছিলেন পুলিশকর্তা। যাঁহার পুলিশবাহিনী সমাজবিরোধী দর্শনে টেবিলের অধোদেশে আত্মগোপন করিবার শিল্পও রপ্ত করিয়াছে। অধিকন্তু শিল্প বিপ্লবের ধাত্রীভূমিতে শিল্প অন্বেষণে যাত্রার পরিকল্পনা অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যা হইল এই পরিকল্পনার কতদূর ফলপ্রসূ হইল তাহা রহস্যাবৃতই রহিয়া গেল। সপারিষদ লন্ডন ভ্রমণ অন্তে রাজ্যবাসীর প্রাপ্তির ভাঁড়ার কি শুধুমাত্র জঞ্জাল আবিষ্কার আর স্বাস্থ্যোদ্ধারে টেমসতীরে প্রাতঃভ্রমণ? জানিবার সবিশেষ আগ্রহ রহিল। অবশ্য লন্ডন প্রেমীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ কেহ বলিতেই পারেন — 'আমাদের টাকায় (সরকারী অর্থ) আমরা বেড়াতে যাই আর শিল্প আনতে যাই আপনাদের কি?' কারণ তিনি সরকারী কোষাগারকে 'আমাদের টাকা' বলিতে অভ্যস্ত। যেমন বলিয়াছিলেন কলিকাতা ও যাদবপুর সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে।

পুনশ্চঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করিয়া বিদেশ ভ্রমণে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে ক্ষতি ক্যামেরন সাহেবেরই হইল। সাক্ষাৎ হইলে তিনি গঙ্গার তীরের ন্যায় টেমসতীরেও 'তেলেভাজা' শিল্প গড়িবার প্রস্তাব পাইলেও পাইতে পারিতেন। সঙ্কটগ্রস্ত ব্রিটিশ অর্থনীতি কিছুটা চাঙ্গা হইত। লন্ডনবাসীর ফাস্টফুড আইটেমে নতুন খাদ্য সংযোজিত হইত। কথায় কথায় ইংরাজী বলিতে অভ্যস্ত মদীয় লন্ডন-প্রেমী চট্‌জলদি 'আলুচপ'-এর ইংরাজী নামকরণও করিয়া দিতেন— 'পোটাটো সাট্-আপ'! □

৭ ভাদ্র, ১৪২২

শোক সংবাদ

এ পি জে আব্দুল কালাম

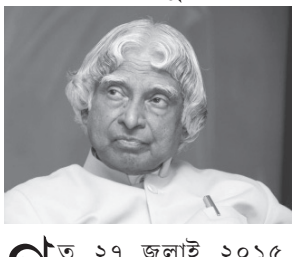

গত ২৭ জুলাই ২০১৫, ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম প্রয়াত হয়েছেন। ঐ দিন মেঘালয়ের শিলং-এ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-এর একটি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে এক দরিদ্র পরিবারে ডঃ কালাম জন্মগ্রহণ করেন। চূড়ান্ত দারিদ্র ও দুঃখকষ্টের মধ্যে থেকেই তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। এমনকি কৈশোরে বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ বিক্রি করে তাঁকে লেখাপড়ার খরচ চালাতে হত। তিনি মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে স্নাতক হন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীন 'প্রতিরক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন' বিভাগে যোগদান করেন। 'মিসাইল ম্যান' নামেও তিনি বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত ছিলেন। পরবর্তী পর্বে একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি 'ইসরো'-র সাথে যুক্ত হন। ১৯৭২-১৯৯০ সময় পর্বে তিনি মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং উপগ্রহ ও মিশাইল তৈরির ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেন। ২০০২ সালের জুলাই মাসে দেশের একাদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালে 'ভারত রত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। সাধারণ মানুষ, বিশেষত যুব সমাজের সাথে তাঁর মেলামেশা করার দারুণ আগ্রহ ছিল এবং তিনি সর্বদাই যুব সমাজকে ইতিবাচক চিন্তায় পরিচালনা করতে চাইতেন। তাঁর কথা ও কাজ দেশের মানুষের কাছে তাঁকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। □

আলোচনা সভা

বিগত ৩১ জুলাই '১৫ বারুইপুরে জেলা সংগঠন দপ্তরে "২ সেপ্টেম্বর, '১৫, রাজ্যের কর্মচারীসহ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্তদের আহূত ধর্মঘটে আমাদের ভূমিকা" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক ছিলেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা 'সংগ্রামী হাতিয়ার'এর প্রাক্তন সম্পাদক, প্রণব চট্টোপাধ্যায়। আলোচক সারা রাজ্য তথা দেশের সামগ্রিক পটভূমিকায় কর্মচারী-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে সার্বিক আক্রমণ, জনজীবনকে বিপর্যস্ত করার সবরকম চক্রান্তের প্রসঙ্গগুলি সবিস্তারে তুলে ধরেন। পরিস্থিতির অপর ইতিবাচক দিক হল, সর্বত্র দেশের মানুষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন কর্মসূচীতে শামিল হচ্ছেন। শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বৃহত্তর মঞ্চের আহ্বানে সারা রাজ্যে স্বাধীনভাবে নিজস্ব নয় দফা দাবিতে ২ সেপ্টেম্বর '১৫ ধর্মঘটের গুরুত্ব প্রচার আন্দোলনে প্রত্যেকের স্ব-উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ আগস্ট '১৫ 'স্ট্রাইক নোটিশ ডে'র কর্মসূচীতে অশগ্রহণ করানোর প্রয়োজনীয়তার উপর মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

সভায় ৩০০ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য

‘এরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে’ সুতরাং...

অশোক রায়

শ্রদ্ধেয় চলচ্চিত্রকার প্রয়াত সত্যজিৎ রায়-এর হীরক রাজার উক্তি হিসাবে বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের কথার শিরোনাম বিবেচনা করা আশাকরি অন্যায় হবে না। কারণ ‘সুতরাং...’ এর মধ্যেই আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি বর্তমানে এ রাজ্যে হীরক রাজার শিক্ষামন্ত্রীর উদ্যোগের হুবহু পুনরাভিনয়ে। চলচ্চিত্রে যেমন হিতোপদেশ এর বদলে হীরক রাজার কথা প্রচারের উদ্যোগ দেখেছি — বর্তমানে এরাজ্যেও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী লিখিত ‘কথাঞ্জলি’ গ্রন্থটি প্রায় অবশ্যপাঠ্য করার সাথে যার অমিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সর্বশেষ ২১ জুলাই ’১৫ ধর্মতলার সমাবেশেও যেভাবে ‘দামাল ছেলেদের পছন্দ করি’ — বলে দেদার সার্টিফিকেট দিলেন এবং সাথে হাততালি কুড়োলেন (সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টিং অনুযায়ী) রাজ্যের কর্ণধার, তাতে আগামী দিনে শ্রমশক্তিকে তৈরি করে নিতে চায়। যাতে তাদের শোষণযন্ত্রটা বাধাহীন ভাবে চলতে পারে।

প্রথমটার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বোচ্চ স্তরে এই চাহিদার সাথে সহমত পোষণকারীদের নিয়োগ। সে দেশের মানবসম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী থেকে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের প্রধানরাই হোক বা এ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে কলেজের, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ বা উপাচার্যই হোক।

দ্বিতীয়টার জন্য ‘দামাল ছেলেদের’ ময়দানে আমদানি এবং সরকারীভাবে প্রশ্রয় দান। সেটা রায়গঞ্জের মত অধ্যক্ষকে প্রকাশ্য চত্বরে বের করে হেনস্তাই (৫/১/১২) হোক বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এত অধ্যাপককে মাটিতে ফেলে পেটানোই (১/৭/১৫) হোক। এই ধারা সমানে চলেছে ক্রমবর্ধমান হারে।

আবার সদ্য সদ্য বর্ধমান রাজ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তারকেশ্বর মণ্ডল মহাশয় ৩ আগস্ট ২০১৫ তাঁর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক পেটানোর ফলশ্রুতিতে মিডিয়ার সামনে এসে পড়েছেন — যেখানে বেশ জোরের সঙ্গেই তিনি বলছেন, ‘তৃণমূল করি, হাজার লিখেও আমার কিচ্ছু করতে পারবেন না।’ (সংবাদ সূত্র ‘এইসময়’ পত্রিকা ৬ আগস্ট ২০১৫)। আশা করি মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আমরা এই নিবন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর যোগ্যতা বা ব্যাপম কেলেঙ্কারির মতো ঘটনায় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উক্তি বা ফিল্ম ইস্টিটিউটে যুধিষ্ঠির চরিত্রে অভিনয়খ্যাত গজেন্দ্র চৌহান মহাশয়ের নিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা স্থানাভাবে রাখছি না, সংবাদপত্রেই তার বিশদ বিবরণ পাঠকবন্ধুদের দৃষ্টিতেই আছে। কিন্তু এ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান হাল নিয়ে কিছু ভাবার সময় এসেছে, কারণ ভুক্তভোগী আমরা সকলেই।

রাজ্যের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎকর্ষতার নাম করে কার্যত দখল করার উদ্যোগ শুরু প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে অনুমোদন পাওয়ার পর মেন্টর গ্রুপ গঠন, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের (যাঁরা বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ছিলেন) নিয়ে। যদি সেই মেন্টর গ্রুপ থেকে অনেকেই পদত্যাগ করে চলে এসেছেন, কেউ কেউ প্রকাশ্য প্রতিবাদের মঞ্চেও হাজির হয়েছেন এটা ভাল লক্ষণ। কিন্তু ২০১২ থেকে ২০১৫ এই ৩ বছরে ৩ জন উপাচার্য হয়েছেন। প্রথম অমিতা চট্টোপাধ্যায়, যাঁর আমলেই ১০ এপ্রিল ২০১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলী বহিরাগতরা হামলা করে এবং বেকার ল্যাবরেটরি ভাংচুর করে। দ্বিতীয় মালবিকা সরকার, তৃতীয় বর্তমানে কর্মরত অনুরাধা লোহিয়া (তিনিও সম্প্রতি চলে যাবার কথা বলছেন বলে মিডিয়ায় প্রকাশিত)। এছাড়াও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক তথা বিজ্ঞানী সব্যসাচী ভট্টাচার্য সহ ১২ জন অধ্যাপক গত ২ বছরে ঐ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেড়ে চলে গেছেন। উৎকর্ষতার নামে দলতন্ত্র কায়েম করার ইতিকথা আমরা দেখছি নিত্যদিন মিডিয়ার কল্যাণেই। অতিসম্প্রতি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ আগস্ট ২০১৫ মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের লাঠিপেটা পরদিন সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যপালের গাড়িতে থাকার জন্য সেই গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ এবং পুলিশি তৎপরতা উৎকর্ষতার নমুনাই বটে।

তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গত বছরে ৩ জন উপাচার্য বদল, প্রথম জন শৌভিক ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় প্রদীপ নারায়ণ বোস, তৃতীয় অভিজিৎ চক্রবর্তী (যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ডেকে স্বনামখ্যাত (!) হয়েছেন)। বর্তমানে গত ১৬ জুলাই ২০১৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ বছর উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করা (ইতিমধ্যেই শিক্ষকদের উপর আক্রমণে তাঁর ভূমিকা নিয়ে মেরুদণ্ড আছে কিনা বলে বিভিন্ন মিডিয়ায় সন্দেহ প্রকাশ করেছে) ডঃ সুরঞ্জন দাস চতুর্থ উপাচার্য হিসাবে যোগদান করেছেন। আবার ঐদিনই অর্থাৎ ১৬ জুলাই ২০১৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ইস্তফা দিয়েছেন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে সেই অন্যতম বুদ্ধিজীবী সুগত মারজিত মহাশয় সমাসীন হয়েছেন। এছাড়াও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এরাজ্যের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী শুধুমাত্র তাঁর মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য এখান থেকেই উপাচার্যের ঘরে বসে পরীক্ষা দিয়ে ‘ডক্টরেট’ হয়েছেন) তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে, প্রতিদিন কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা বা নৈরাজ্যের খবরে।

২৪ এপ্রিল ২০১২ ভাঙ্গড়ে অধ্যাপিকাকে জলের জগ ছুঁড়ে মারা ‘তাজা ছেলে’রা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ গার্ডেনরিচের হরিমোহন কলেজে ছাত্র নির্বাচনকে ঘিরে পুলিশ অফিসার মেরে ফেলা দিয়ে শুরু করে বর্তমানে রাজ্যের প্রায় সমস্ত কলেজে ছাত্র সংসদ দখল করে চুটিয়ে দামালগিরি করে চলেছেন। অবশ্য ভর্তি হতে হলে ‘৫০ হাজার রেডি রাখুন’ এই শ্রীবাণী শোনার অভিজ্ঞতা বহু অভিভাবকদের ইতিমধ্যেই হয়েছে। যেদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ধর্মতলায় দামাল ছেলেদের দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন সেইদিনই অর্থাৎ ২১ জুলাই ২০১৫, সুভাষগ্রামের বাসিন্দা সনিয়া মণ্ডল গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার অপরাধ কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংরক্ষিত আসনের মেধা তালিকায় ১০১-এ নাম ছিল। ২ জুলাই কাউন্সেলিং থেকে তাকে বের করে দেয়, দেরি করে আসার জন্য। পরে কলেজের এক ছাত্র নেতাকে ৫০০০ টাকা সহ মার্কশিট ইত্যাদি কাগজ জমা রেখে চলে আসে, অবশ্য পরে আরও অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সর্বশেষ ২০ জুলাই সনিয়া কলেজে ঐ ছাত্রনেতার সাথে দেখা করে মার্কশিট ফেরৎ চায়, কিন্তু বকেয়া টাকা না পেলে মার্কশিট দেওয়া হবে না বলে প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপরই শহীদ দিবসের প্রকৃত শহীদ (একে আত্মহত্যা না খুন তা পাঠকই বিচার করবেন) হয়ে গেলেন। (সূত্র ‘এইসময়’ ৩০/৭/১৫) আগামীতে আরও কত যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা হবে, শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য বন্ধ করার লক্ষ্যে কত সুদীপ্ত গুপ্তদের প্রাণ যাবে তা ভবিষ্যৎই বলবে। তবে ইতিহাসের শিক্ষাই এই, যত বেশি আক্রমণ তত বেশি প্রতিরোধ হবেই। সন্ত্রাসের যুগ চিরস্থায়ী হয় না।

সর্বশেষ শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি বলে এই নিবন্ধের ইতি টানব। প্রথম হলো এসএসসি — যার সুনাম গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। গত ৪ বছরে ১ বার মাত্র পরীক্ষা হয়েছে। নিয়োগ নিয়ে মিডিয়ায় বহু বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে পাঠকের চোখ এড়ায়নি নিশ্চয়। সেই গৌরবজনক প্রতিষ্ঠানের দখল নিতে মরীয়া বর্তমান সরকার, প্রথমজন চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, দ্বিতীয়জন প্রদীপ শূর, তৃতীয় জন বর্তমানে কর্মরত সুবীরেশ ভট্টাচার্য। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের প্রতিবাদে বঞ্চিতরা ধারাবাহিক অনশন সহ বিভিন্ন ধারায় আন্দোলনে আছেন, পার্শ্বশিক্ষকরা আন্দোলনে আছেন, পুলিশের লাঠিপেটা জুটেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, চাকরি সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। সর্বশেষ জুলাই মাস জুড়েই ‘টেট’ এর ফর্ম তোলার জন্য নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে প্রায় ২১ লক্ষ উচ্চশিক্ষিত সহ যুবক যুবতীরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আগামী ৩০ আগস্ট ২০১৫ হবে সেই ৩৫০০০ (ঘোষিত) পদের জন্য পরীক্ষা। বিগত পরীক্ষাটি হয়েছিল ২০১৩ সালে ৩১ মার্চ যেখানে সমসংখ্যক পদের জন্য প্রায় ২০ লক্ষ ছেলেমেয়েরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র ১৭ হাজারের মতো নিয়োগ সেবারে হয়েছিল — কিন্তু তারা কারা, কিভাবে নিয়োগপত্র পেয়েছেন সে সবই মিডিয়ার কল্যাণে সকলেই দেখেছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন। ফলে আগামী ‘ টেট’ পরীক্ষার পর যদি ৩৫০০০ জনই সফল হয়েছেন নিরপেক্ষভাবে, এটা ধরেও নেওয়া যায় তাহলেও ২০ লক্ষ ৬৫০০০ জনের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারের দিকেই এটা বুঝে নিয়ে এই অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার শপথ আজ প্রতিটি মানুষের নেওয়া প্রয়োজন। ‘৯ কোটির জনগণের রাজ্যে ১০ কোটির

রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনের হাল কোথায় দাঁড়াবে ভেবে শিউরে উঠতে হয়। এই দামাল ছেলেদের ‘দুষ্টুমির’ কিছু নমুনা স্মরণ করানোর আগে সাম্প্রতিক ২টি ঘটনা বা দুর্ঘটনা যেভাবেই বলি না কেন তার জলজ্যান্ত সাক্ষী আমরা সহ সমগ্র পাঠককূল। প্রথমটি হলো এরাজ্যের এমন কোন পরিবার নেই যে পরিবারের কোন না কোন ছাত্র/ছাত্রী এবারে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর কলেজে কলেজে ভর্তি হতে চরমতম দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েননি। একই ভাবে দ্বিতীয়টি হলো, প্রাইমারি টিচার্স নিয়োগ সংক্রান্ত টেট ফর্ম তোলা নিয়ে অমানুষিক অব্যবস্থার মোকাবিলা করেননি এমন পরিবারও এরাজ্যে বিরল। সুতরাং এইসব ভুক্তভোগীদের কাছে এরাজ্যে শিক্ষাঙ্গনের হালহকিকত বর্ণনা করা মায়ের কাছে মাসির গল্পের মতো। আমরা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে শুধুমাত্র বোঝার চেষ্টা করবো — কেন এই ধ্বংসযজ্ঞ? কাদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য, এরাজ্যেই শুধু বলি কেন গোটা দেশের শিক্ষাঙ্গনের উপর এই আক্রমণ?

প্রথম কারণ অবশ্যই দেশের এবং রাজ্যের শাসকেরা চায় শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করতে। ফলে যেটুকু সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা আছে তাও অকেজো করতে। দ্বিতীয় কারণ শাসকদের উপযোগী করে মানুষ তথা ছাত্রছাত্রীদের বেধড়ক পেটানোর ফলশ্রুতিতে মিডিয়ার সামনে এসে পড়েছেন — যেখানে বেশ জোরের সঙ্গেই তিনি বলছেন, ‘তৃণমূল করি, হাজার লিখেও আমার কিচ্ছু করতে পারবেন না।’ (সংবাদ সূত্র ‘এইসময়’ পত্রিকা ৬ আগস্ট ২০১৫)। আশা করি মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আমরা এই নিবন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর যোগ্যতা বা ব্যাপম কেলেঙ্কারির মতো ঘটনায় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উক্তি বা ফিল্ম ইস্টিটিউটে যুধিষ্ঠির চরিত্রে অভিনয়খ্যাত গজেন্দ্র চৌহান মহাশয়ের নিয়োগ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা স্থানাভাবে রাখছি না, সংবাদপত্রেই তার বিশদ বিবরণ পাঠকবন্ধুদের দৃষ্টিতেই আছে। কিন্তু এ রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান হাল নিয়ে কিছু ভাবার সময় এসেছে, কারণ ভুক্তভোগী আমরা সকলেই।

রাজ্যের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎকর্ষতার নাম করে কার্যত দখল করার উদ্যোগ শুরু প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে অনুমোদন পাওয়ার পর মেন্টর গ্রুপ গঠন, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের (যাঁরা বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ছিলেন) নিয়ে। যদি সেই মেন্টর গ্রুপ থেকে অনেকেই পদত্যাগ করে চলে এসেছেন, কেউ কেউ প্রকাশ্য প্রতিবাদের মঞ্চেও হাজির হয়েছেন এটা ভাল লক্ষণ। কিন্তু ২০১২ থেকে ২০১৫ এই ৩ বছরে ৩ জন উপাচার্য হয়েছেন। প্রথম অমিতা চট্টোপাধ্যায়, যাঁর আমলেই ১০ এপ্রিল ২০১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলী বহিরাগতরা হামলা করে এবং বেকার ল্যাবরেটরি ভাংচুর করে। দ্বিতীয় মালবিকা সরকার, তৃতীয় বর্তমানে কর্মরত অনুরাধা লোহিয়া (তিনিও সম্প্রতি চলে যাবার কথা বলছেন বলে মিডিয়ায় প্রকাশিত)। এছাড়াও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক তথা বিজ্ঞানী সব্যসাচী ভট্টাচার্য সহ ১২ জন অধ্যাপক গত ২ বছরে ঐ ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেড়ে চলে গেছেন। উৎকর্ষতার নামে দলতন্ত্র কায়েম করার ইতিকথা আমরা দেখছি নিত্যদিন মিডিয়ার কল্যাণেই। অতিসম্প্রতি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১ আগস্ট ২০১৫ মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের লাঠিপেটা পরদিন সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী রাজ্যপালের গাড়িতে থাকার জন্য সেই গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ এবং পুলিশি তৎপরতা উৎকর্ষতার নমুনাই বটে।

তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গত বছরে ৩ জন উপাচার্য বদল, প্রথম জন শৌভিক ভট্টাচার্য, দ্বিতীয় প্রদীপ নারায়ণ বোস, তৃতীয় অভিজিৎ চক্রবর্তী (যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ডেকে স্বনামখ্যাত (!) হয়েছেন)। বর্তমানে গত ১৬ জুলাই ২০১৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ বছর উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করা (ইতিমধ্যেই শিক্ষকদের উপর আক্রমণে তাঁর ভূমিকা নিয়ে মেরুদণ্ড আছে কিনা বলে বিভিন্ন মিডিয়ায় সন্দেহ প্রকাশ করেছে) ডঃ সুরঞ্জন দাস চতুর্থ উপাচার্য হিসাবে যোগদান করেছেন। আবার ঐদিনই অর্থাৎ ১৬ জুলাই ২০১৫ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ইস্তফা দিয়েছেন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে সেই অন্যতম বুদ্ধিজীবী সুগত মারজিত মহাশয় সমাসীন হয়েছেন। এছাড়াও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এরাজ্যের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী শুধুমাত্র তাঁর মায়ের ইচ্ছা পূরণের জন্য এখান থেকেই উপাচার্যের ঘরে বসে পরীক্ষা দিয়ে ‘ডক্টরেট’ হয়েছেন) তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে, প্রতিদিন কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা বা নৈরাজ্যের খবরে।

২৪ এপ্রিল ২০১২ ভাঙ্গড়ে অধ্যাপিকাকে জলের জগ ছুঁড়ে মারা ‘তাজা ছেলে’রা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ঐ ছাত্রনেতার সাথে দেখা করে মার্কশিট ফেরৎ চায়, কিন্তু বকেয়া টাকা না পেলে মার্কশিট দেওয়া হবে না বলে প্রত্যাখ্যাত হয়। তারপরই শহীদ দিবসের প্রকৃত শহীদ (একে আত্মহত্যা না খুন তা পাঠকই বিচার করবেন) হয়ে গেলেন। (সূত্র ‘এইসময়’ ৩০/৭/১৫) আগামীতে আরও কত যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা হবে, শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য বন্ধ করার লক্ষ্যে কত সুদীপ্ত গুপ্তদের প্রাণ যাবে তা ভবিষ্যৎই বলবে। তবে ইতিহাসের শিক্ষাই এই, যত বেশি আক্রমণ তত বেশি প্রতিরোধ হবেই। সন্ত্রাসের যুগ চিরস্থায়ী হয় না।

সর্বশেষ শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি বলে এই নিবন্ধের ইতি টানব। প্রথম হলো এসএসসি — যার সুনাম গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। গত ৪ বছরে ১ বার মাত্র পরীক্ষা হয়েছে। নিয়োগ নিয়ে মিডিয়ায় বহু বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে পাঠকের চোখ এড়ায়নি নিশ্চয়। সেই গৌরবজনক প্রতিষ্ঠানের দখল নিতে মরীয়া বর্তমান সরকার, প্রথমজন চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, দ্বিতীয়জন প্রদীপ শূর, তৃতীয় জন বর্তমানে কর্মরত সুবীরেশ ভট্টাচার্য। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের প্রতিবাদে বঞ্চিতরা ধারাবাহিক অনশন সহ বিভিন্ন ধারায় আন্দোলনে আছেন, পার্শ্বশিক্ষকরা আন্দোলনে আছেন, পুলিশের লাঠিপেটা জুটেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, চাকরি সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। সর্বশেষ জুলাই মাস জুড়েই ‘টেট’ এর ফর্ম তোলার জন্য নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে প্রায় ২১ লক্ষ উচ্চশিক্ষিত সহ যুবক যুবতীরা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আগামী ৩০ আগস্ট ২০১৫ হবে সেই ৩৫০০০ (ঘোষিত) পদের জন্য পরীক্ষা। বিগত পরীক্ষাটি হয়েছিল ২০১৩ সালে ৩১ মার্চ যেখানে সমসংখ্যক পদের জন্য প্রায় ২০ লক্ষ ছেলেমেয়েরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র ১৭ হাজারের মতো নিয়োগ সেবারে হয়েছিল — কিন্তু তারা কারা, কিভাবে নিয়োগপত্র পেয়েছেন সে সবই মিডিয়ার কল্যাণে সকলেই দেখেছেন, জেনেছেন, বুঝেছেন। ফলে আগামী ‘ টেট’ পরীক্ষার পর যদি ৩৫০০০ জনই সফল হয়েছেন নিরপেক্ষভাবে, এটা ধরেও নেওয়া যায় তাহলেও ২০ লক্ষ ৬৫০০০ জনের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারের দিকেই এটা বুঝে নিয়ে এই অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরার শপথ আজ প্রতিটি মানুষের নেওয়া প্রয়োজন। ‘৯ কোটির জনগণের রাজ্যে ১০ কোটির কর্মসংস্থান করেছি’ বলে প্রচারের ফানুসকে মোকাবিলা করেই সত্যকে সামনে আনার লড়াই আজ, দেশ রক্ষার লড়াই, আগামী প্রজন্ম রক্ষার লড়াই। এই লড়াইয়ে জয়ী আমাদের হতেই হবে। তাই আমাদেরও স্লোগান ‘হোক দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান।’ □

রক্তদান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কোচবিহার জেলা শাখার উদ্যোগে ২৬/০৭/২০১৫ কর্মচারী ভবনে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক আশীষ গোস্বামী। শিবির উদ্বোধন করেন দেবাশীষ রায়, জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক। এছাড়া জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অপর যুগ্ম আহ্বায়ক পুলক বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন সমর ভট্টাচার্য, জেলা সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সভায় কর্মচারী পরিবার পরিজনসহ দেড়শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে ৯ জন মহিলাসহ মোট ৫৯ জন রক্তদান করেন। □

২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘট

অর্জিত অধিকার রক্ষায় অপরিহার্য সংগ্রাম

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

দেশের ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী শিক্ষকদের অর্ধশতাধিক সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলির যুক্ত আহ্বানে ২৬ মে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশন থেকে ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে ২ সেপ্টেম্বর সর্বভারতীয় ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ১৯৯১ সালে জাতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উদারিকরণের মধ্যে দিয়ে নব্য উদারনীতির প্রয়োগ শুরু হয়। নরসিমা রাও পরিচালিত কংগ্রেস সরকারের আমলে প্রথমে তা চালু হলেও পরবর্তীকালে চারজন প্রধানমন্ত্রীর আমলে তা অব্যাহত ছিল এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর আমলেও তা বজায় আছে। নরসিমা রাও সরকারের শাসনে নব্য উদারনীতির বিরুদ্ধে ২৯ নভেম্বর'৯১ বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলি প্রথম ধর্মঘট সংগঠিত করে। পরবর্তীকালে ১৯৯২ (১৬ জুন), ১৯৯৩ (৯ সেপ্টেম্বর), ১৯৯৪ (২৯ সেপ্টেম্বর), ১৯৯৮ (১১ ডিসেম্বর), ২০০০ (১১ মে), ২০০২ (১৬ এপ্রিল), ২০০৩ (২১ মে), ২০০৪ (২৪ ফেব্রুয়ারি), ২০০৪ (২৯ সেপ্টেম্বর), ২০০৬ (১৪ ডিসেম্বর), ২০০৮ (২০ আগস্ট) ১২টি সর্বভারতীয় ধর্মঘট বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির উদ্যোগে সংগঠিত হয়। কংগ্রেস পরিচালিত আই এন টি ইউ সি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (আর এস এস) পরিচালিত বি এম এস এই ধর্মঘটগুলিতে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু উভয় সংগঠনের বিপুল অনুগামী শ্রমিকরা নেতৃত্বের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেই এইসব ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং নব্য উদারনীতির ক্রমবর্ধমান আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ ধর্মঘটে আই এন টি ইউ সি এবং ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত চতুর্দশ ধর্মঘটে বি এম এস অংশগ্রহণ করে। ২০১৩ সালের ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি পঞ্চদশ ধর্মঘটেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। অর্থাৎ নব্য উদারনীতির পরিণতিতে ভারতবর্ষের শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলন এক ঐক্যবদ্ধ চেহারা নিয়েছে। লালঝাণ্ডা, তেরঙ্গাঝাণ্ডা, গেরুয়াঝাণ্ডা মিলে এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্ম দিয়েছে—যা এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীনতার পর অনেক বড় বড় শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে ঠিক, কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের এই ঐক্যবদ্ধ চেহারা দেখা যায়নি। বর্তমান ধর্মঘটের পটভূমিতে এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

দুই

ধর্মঘটের দাবি সনদটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বতন এন ডি এ সরকার এবং বর্তমান নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত দ্বিতীয় এন ডি এ সরকারের আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের প্রচলিত শ্রম আইনগুলিকে একদিকে প্রয়োগ না করা এবং অন্যদিকে দেশী-বিদেশী বৃহৎ পুঁজিপতিদের দাবি অনুযায়ী তাদের স্বার্থে শ্রম আইনগুলিকে সংশোধন করতে উদ্যোগী হওয়া। শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সাধনে ৫ (ক) ও ৫ (খ) ধারাকে এমনভাবে সংশোধন করা হচ্ছে যার পরিণতিতে কারখানা ক্ষেত্রে ৯০ শতাংশের বেশি শ্রমশক্তি এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিক 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার' নীতির সম্মুখীন হবে। মোদী সরকার যুক্তিগ্রাহ্য ও সরলীকরণের অজুহাতে ৪৪টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে পাঁচটি শ্রম কোডে গুচ্ছবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করেছে। শ্রমিকশ্রেণীকে নিরস্ত্র করা এবং সংগঠিত হওয়া ও তাদের অধিকারের সংগ্রামকে ধ্বংস করাই হলো এর অন্যতম লক্ষ্য। অপর লক্ষ্যটি হলো মালিকদের অবাধ শোষণকে নিশ্চিত করা। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই এল ও) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়া সত্ত্বেও এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশনকে (৮৭ ও ৯৮) স্বীকৃতি দেননি। ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও দরকষাকষির অধিকারের প্রসঙ্গ এর সাথে যুক্ত।

দাবি সনদের অপর একটি অংশ হলো সামাজিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গ। বর্তমানে দেশের ৯৩ শতাংশ শ্রমিক ইনফর্মাল সেক্টর (চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত, ঠিকা শ্রমিক, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিযুক্ত প্রভৃতি)-এ কর্মরত। দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি ডি পি) এর ৬৬ শতাংশ এই ক্ষেত্রটি উৎপাদন করে। অর্থমূল্যে এর পরিমাণ ৯০ লক্ষ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রটি থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা কেন্দ্রীয় সরকার অর্জন করে। অথচ এদের জন্য কোনো ন্যূনতম বেতন নেই। নেই কোনো সামাজিক নিরাপত্তা। দাবি সনদে এক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা বেতনের দাবি তাই গুরুত্বপূর্ণ এবং সঙ্গতও বটে। কারণ পঞ্চদশ ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনে ন্যূনতম বেতন নির্ধারণের যে সব মাপকাঠি স্থির হয়েছিল, তার ভিত্তিতে বর্তমানে এই পরিমাণ বিশ হাজার টাকার কম হবে না [সূত্র ঃ ফ্রন্ট লাইন, ২১ আগস্ট]। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ হ্রাস পাচ্ছে এবং অন্যদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে অনিয়মিত শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা। উভয়ের মধ্যে বেতন ভাতার পার্থক্য বিপুল এবং সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে রয়েছে বিপুল বৈষম্য। এর পরিণতিতে উৎপাদন ব্যয়ে শ্রমিকদের মজুরি যখন ক্রমহ্রাসমান তেমনই অন্যদিকে দ্রুত বেড়ে চলেছে মালিকদের মুনাফা। এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, এই নীতির পরিণতিতে শিল্প ক্ষেত্রে মজুরির অংশ ১৯৮২-৮৩ সালে ৩০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১২-১৩ সালে ১২.৯ শতাংশ হয়েছে; অন্যদিকে আলোচ্য সময়ে মালিকদের মুনাফার অংশ ৩০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ শতাংশ হয়েছে। এই সময়ে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের জি ডি পি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা রয়েছে অথচ মজুরির অংশ কমছে। পুঁজিপতিদের মুনাফার হার জি ডি পি বৃদ্ধির গড় হারের থেকে অনেক বেশি।

সামাজিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনিয়মিত শ্রমিক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সামাজিক নিরাপত্তা নেই। কয়েক বছর পূর্বে ড. অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির প্রতিবেদনে এদের জীবনবিমা, স্বাস্থ্যবিমা এবং ৬০ বছরের পর পেনশনের ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছিল। সেই সময় এরজন্য আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল পাঁচ থেকে সাত হাজার কোটি টাকা। বিগত দুটি ইউ পি এ সরকার এবং বর্তমানের মোদী সরকার তা কার্যকর করেনি। পরন্তু বর্তমানের চালু থাকা ই এস আই এবং ই পি এফ সংকুচিত করে তা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। এই প্রশ্নে দাবিটি তাই গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে স্থায়ী কাজে ঠিকা প্রথা বন্ধ করা সাপেক্ষে সমকাজে সমবেতনের ভিত্তিতে সকল ঠিকা। শ্রমিককে স্থায়ী কর্মীদের সমান মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দাবিটিকে বিচার করতে হবে।

দাবি সনদে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে যে সমস্ত প্রকল্প কর্মীরা রয়েছেন, তাঁদের শ্রমিকের অধিকার ও স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রকল্পগুলিতে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৪৩,৪৪,৪৫ তম শ্রম সম্মেলনে কতকগুলি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি ৪৬তম শ্রম সম্মেলনে এ বিষয়ে মোদী সরকার কোনো ইতিবাচক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি। পরন্তু চলতি বছরের সাধারণ বাজেটে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প, আই সি ডি এস প্রভৃতি প্রকল্পে ব্যাপক বরাদ্দ ছাঁটাই করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত দাবিগুলি ছাড়াও ১২ দফা দাবির মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি রোধ, সীমাহীন বেকারি রোধে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রধান ভিত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নীকরণ বন্ধ প্রভৃতি দাবিগুলি রয়েছে যা দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বার্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ধর্মঘটের দাবি সনদটি কার্যত বৃহত্তর জনগণের দাবি সনদ বা 'পিপলস চার্টার'-এ পরিণত হয়েছে। সর্বভারতীয় ধর্মঘটের এই দিকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তিন

২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটে বিভিন্ন রাজ্যে বহু আঞ্চলিক স্তরের ট্রেড ইউনিয়ন অতীতের ধর্মঘটগুলির ন্যায় এবারেও অংশগ্রহণ করবে।আবার বিভিন্ন সেক্টরে শ্রমিক-কর্মচারীরা সর্বভারতীয় দাবিগুলির সাথে নিজস্ব ক্ষেত্রের দাবিগুলি যুক্ত করে ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটে শামিল হচ্ছে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে সি আই টি ইউ-এর পক্ষ থেকে সর্বভারতীয় দাবিগুলির সাথে (ক) বন্ধ ও রুগ্‌ণ কারখানার পুনরুজ্জীবন, (খ) কলকাতার ও হলদিয়া বন্দর রক্ষা এবং (গ) ভূমি বিল বাতিল-এই তিনটি দাবি যুক্ত হয়েছে।

এই রাজ্যের ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের ৩৫টি সংগঠনের যুক্ত মঞ্চের আহ্বানে (ক) ১৫ হাজার টাকা ন্যূনতম বেতন, (খ) শ্রম আইনের সংস্কার বাতিল, সর্বভারতীয় এই দুটি দাবি সহ নিজস্ব সাত দফা দাবির ভিত্তিতে একইদিনে ধর্মঘটের কর্মসূচি প্রতিপালিত হবে। ধর্মঘটের দাবি সনদে রয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দাবি অর্থাৎ (ক) বকেয়া ৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা প্রদান এবং (খ) বেতন কমিশন / কমিটি গঠন। এই দুটি দাবির তিনটি দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এর অর্থনৈতিক দিক। ৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকায় একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারী সর্বনিম্নস্তরে ৩১৬৮ টাকা করে প্রতি মাসে লোকসান করছেন। ৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা ছয়টি কিস্তিতে বকেয়া রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম কিস্তিটি অর্থাৎ সাত শতাংশ ২০১২ সালের ১ জুলাই থেকে বাকি। বাকি পাঁচটি কিস্তির হার ৮ শতাংশ, ১০ শতাংশ, ১০ শতাংশ, ৭ শতাংশ এবং ৬ শতাংশ। এই হিসাবে বিগত চার বছরে সর্বনিম্নস্তরে একজন কর্মচারীর লোকসানের পরিমাণ ৬৭ হাজার ৯১২ টাকা। দ্বিতীয়ত, মহার্ঘভাতার প্রসঙ্গটি অধিকারের বিষয়। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের কর্মচারীরাই কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাচ্ছেন। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই অধিকারকেই এখন অস্বীকার করছে। মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী একাধিকবার এই প্রশ্ন তুলছেন। অথচ বিরোধী দলে থাকার সময় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী একাধিকবার কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার ন্যায্যতা স্বীকার করেছেন। তৃতীয়ত, বকেয়া মহার্ঘভাতার প্রশ্নকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট ও তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর ফারাক এখন স্পষ্ট। বামফ্রন্ট সরকার যখন চলে যায় তখন দুই কিস্তিতে ১৬ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাকি ছিল; কিন্তু এদের চার বছরের শাসনে বকেয়ার পরিমাণ ৪৮ শতাংশ। বস্তুতপক্ষে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা প্রথম পায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়। পরবর্তীকালে কংগ্রেস শাসনে তা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল থেকে পুনরায় কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা অর্জিত হয়।

একই বিষয় বেতন কমিশন / কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পূর্বে বামফ্রন্ট সরকারের সময় কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশন গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই রাজ্যে বেতন কমিশন গঠিত হয়েছে। বেতন কমিশনের সুপারিশ কর্মচারী সংগঠনগুলির সাথে আলোচনা করে তা আরো উন্নত রূপে কার্যকর হয়েছে। কিন্তু সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন গঠিত হওয়ার পর এ রাজ্যে ষষ্ঠ বেতন কমিশন / কমিটি গঠনের দাবিটি উপেক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে সর্বনিম্নস্তরে এ রাজ্যের একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারীর বেতনের পরিমাণ ১১ হাজার ৯৮৮ টাকা। কেন্দ্রীয় কর্মচারীর সর্বনিম্ন বেতন (এম টি এসদের ক্ষেত্রে) ১৮ হাজার ২৮০ টাকা। অর্থাৎ প্রায় দেড় গুণ। সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ ও তা লাগু হওয়ার পর দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এ এক নিদারুণ বঞ্চনা।

পূর্বোক্ত দাবি দুটি ছাড়াও রয়েছে বদলির প্রসঙ্গ। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগ্রামী ও গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলিকে ভাঙার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে বেছে বেছে নেতৃত্ব-কর্মী-সংগঠকদের বেআইনীভাবে দূর-দূরান্তে বদলি করা হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ধর্মঘটের অধিকারসহ পূর্ণ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার কর্মচারীদের প্রদান করেছিল। এই আদেশনামা থাকা সত্ত্বেও ২০১২ ও ২০১৩ সালের ধর্মঘট দুটিতে অংশগ্রহণ করার অপরাধে (!) কর্মচারীদের 'ডায়াস নন' করা হয়েছে। এমনকি প্রাপ্য ছুটি পর্যন্ত মঞ্জুর করা হয়নি। প্রশাসনের লক্ষাধিক পদ শূন্য। যে সামান্য নিয়োগ হচ্ছে তা চুক্তি প্রথায়। এই নিয়োগেও কোনো স্বচ্ছতা নেই। পি এস সি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিকে অকেজো করে রাখা হয়েছে। সরকারী দপ্তর, পঞ্চায়েত দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শাসকদলের আশ্রিত সমাজবিরোধীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। মহিলা কর্মচারী ও শিক্ষিকারা পর্যন্ত বাদ যাচ্ছেন না। এছাড়া সি এ স্কিম ও হেলথ স্কিম, বোর্ড কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিটিও দাবি সনদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ন্যায় রাজ্যের কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ধর্মঘটটিও ব্যাপক ঐক্যের ভিত্তিতে সংগঠিত হতে চলেছে... যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চার

সর্বভারতীয় ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে পূর্বের ন্যায় এবারেও বিদেশী কর্পোরেট হাউসগুলি কর্তৃক পরিচালিত প্রচারমাধ্যমগুলি ও ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবীরা 'ধর্মঘট কর্মনাশা', 'ধর্মঘট উন্নয়নবিরোধী' প্রভৃতি বিশেষণে বিশ্লেষিত করে অপপ্রচার শুরু করবে। কিন্তু ধর্মঘটের আর্থ-সামাজিক ন্যায্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ছিল চার্টিস্ট আন্দোলন। ছয় দফা দাবিকে কেন্দ্র করে ১৮৩৭ সালে লন্ডন ওয়ার্কিং-মেনস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে তা সংগঠিত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে সেই আন্দোলন কার্যকর না হলেও বর্তমানে সারা বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তা কিন্তু চার্টিস্ট আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে বিশাল লড়াই হয়। হে মার্কেটের আন্দোলন সকলেরই জানা। এই ধর্মঘট আন্দোলন যদি না হতো তাহলে আট ঘণ্টা কাজের দাবি কি অর্জিত হতো? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ১৯০৮ সালে লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে বোম্বের সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, এর এক দশক পর আমেদাবাদে গান্ধীজির গ্রেপ্তারের পর শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ১৯৪০-এর দশকে নৌবাহিনীতে ধর্মঘট এবং ১৯৪৬ সালে ডাক-তার কর্মচারীদের ধর্মঘট কি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি?

স্বাধীনতা উত্তরকালে পশ্চিমবাংলায় বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরাট লড়াই, খাদ্য আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে শিক্ষকদের ধর্মঘট ও আন্দোলন, ১৯৫৯ সালে খাদ্যের দাবিতে কৃষক আন্দোলন, ১৯৭৪ সালে সর্বভারতীয় রেল ধর্মঘট এবং ঐ বছরেই ৯ এপ্রিল কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার দাবিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট প্রভৃতি রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পুষ্ট করেছে। ১৯৬৭, ১৯৬৯ ও ১৯৭৭ সালে রাজ্যের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ক্ষেত্রে এসব আন্দোলনের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

১৯৯২ সালে নব্য উদারনীতি গৃহীত হওয়ার পর সংগঠিত ১৫টি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট ও সর্বস্তরের ক্ষেত্রগুলির শ্রমিক-কর্মচারীর ধর্মঘটের চাপে কেন্দ্রীয় সরকারী ব্যাঙ্ক, বিমা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পূর্ণাঙ্গ বেসরকারীকরণ করতে পারেনি। সুতরাং জনস্বার্থ-বিরোধী কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে ধর্মঘট সংগঠিত করা এক গুরুত্বপূর্ণ দেশপ্রেমিক কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন বর্তমান সময়ে একান্তই আবশ্যক। □

২ সেপ্টেম্বর'১৫ রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শ্রমিক, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ধর্মঘট

সীমাহীন আর্থিক বঞ্চনা ও প্রশাসনিক আক্রমণের বিরুদ্ধে

যুক্ত আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আসুন আমরা নচিকেতা হই

''কেবল সংগ্রামই শোষিত শ্রেণীকে শিক্ষিত করে তোলে। কেবল সংগ্রামই তার কাছে নিজের ক্ষমতার পরিমাণটা প্রকাশ করে, তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, তার ক্ষমতা বাড়ায়, তার মনকে পরিষ্কার করে, তার সংকল্পকে গড়ে তোলে।''

অসিত কুমার ভট্টাচার্য
যুগ্ম সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটেই যেতে হল। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই। নিজেদের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে, নিজেদের অস্তিত্বকে রক্ষার স্বার্থে। আত্মসম্মান আর আত্মমর্যাদা রক্ষার দাবিতে। কষ্টার্জিত অধিকারগুলিকে রক্ষা করার আর আন্দোলনের অধিকার বহাল রাখার তাগিদে। পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে মহান লড়াই লড়ছেন সেই লড়াইয়ের সাথে গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের লড়াইয়ের সেতুবন্ধনের জন্য। এই সংগ্রাম জরুরী। আমাদের জ্বলন্ত , অমীমাংসিত দাবিগুলির সুমীমাংসার জন্য। প্রয়োজন বুনিয়াদি কতগুলি অধিকার—মত প্রকাশের , সংগঠন করার, সরকারের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা করার, কর্মচারীদের দাবি দাওয়ার সুষ্ঠু ও যুক্তিসংগত সমাধানের জন্য বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষ-আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ ও স্বীকৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আই এল ও) র সর্বজনীন প্রস্তাবগুলির মান্যতার জন্য— ভারত সরকার যার শরিক , কোনো রাজ্য সরকার তার বাইরে যেতে পারে না। স্বাধীনতার পর ৬৮ বছর ধরে তীব্র, তিক্ত ও তীক্ষ্ণ লড়াই করে যে অধিকার ও সাফল্য কর্মচারী আন্দোলন অর্জন করেছে, প্রতিষ্ঠা করেছে, আজ যা ধ্বংসের কিনারায়, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এই ধর্মঘট অনিবার্য, অপরিহার্য ছিল।

২০১১ সালে ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে বিরোধী দল হিসাবে আজকের শাসক দল 'উন্নয়ন' 'গণতন্ত্র', 'সুশাসন' আর 'পরিবর্তন'-এর শ্লোগান হাজির করেছিল। 'পরিবর্তন' এর সেই শ্লোগানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের 'আপ-টু ডেট' মহার্ঘভাতা , ২৭ মাসের বকেয়া বেতন, ৩০ শতাংশ বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল। ছিল পরিবহন ভাতা , শিক্ষাভাতা, দেওয়ার সুস্পষ্ট আশ্বাস। আরও ছিল ষষ্ঠ বেতন কমিশন 'আপডেট' করার নির্বাচনী ইস্তেহার। ২০১১-র নির্বাচনের প্রাক্কালে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী, আজকের মুখ্যমন্ত্রী 'পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে কম বেতন পান, বলে সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করে দুঃখ ঘুচিয়ে দেওয়ার দৃপ্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য তৈরী হয়েছিল। একটি অংশের মধ্যে ধারণাও হয়েছিল যে হয়ত সত্যিই 'সুদিন' আসবে। পশ্চিমবাংলার বঞ্চিত জনসাধারণ না পান, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অন্তত নতুন দিন এল বলে। কিন্তু কি হাল আজ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ?

নতুন সরকার গঠনের পর মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথ বৈঠকে প্রতিশ্রুতি ছিল, ''তিনমাস অন্তর আপনাদের সঙ্গে আমি বৈঠকে বসবো,'' ''আপনাদের দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা করব''। সুনির্দিষ্ট আহ্বান ছিল আপনারা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবেন, দাবি দাওয়া নিয়ে কথা বলবেন। কোনো অসুবিধা হবেনা। সরকার দেখবে। তারপর বসেও ছিলেন একবার ১৬ আগস্ট সেই শেষ বৈঠক, কিন্তু মেটেনি বহু দাবি। পূরণ হয়নি কোনো প্রতিশ্রুতি। আজ ৪৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া, নতুন বেতন কমিশন গঠনের কোনো কথা নেই। ৫ম বেতন কমিশনের সুপরিশসমূহ ঠান্ডা ঘরে। আরো কত দাবি আছে পড়ে। কোনো আলোচনা নেই। তিন ডজনের বেশী চিঠি মুখ্যমন্ত্রীকে সংগঠনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, কোনো উত্তর নেই। শুধু উপেক্ষা আর অবহেলা। অবজ্ঞা আর অপমান। কর্মচারীরা হীনম্মন্যতায় ভুগছেন।

আর ট্রেড ইউনিয়ন করার কি সুযোগ আমরা পেয়েছি? নতুন সরকার আসার পর শুরু হয় সংগঠন দপ্তর দখল। পঞ্চায়েত এলাকায় শহর, শহরতলীতে কর্মচারীদের কাছে তোলা আদায়। শারীরিক নির্যাতন, ভয়-ভীতি-হুমকির শাসানি। শারীরিক নির্যাতন থেকে রেহাই মেলেনি মহিলা কর্মচারীদের। লড়াকু ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, জেলে দেওয়া— বাদ নেই কিছুই। জনসাধারণের , গণতান্ত্রিক শক্তির যে অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই আমাদের অভিজ্ঞতার। ট্রেড ইউনিয়ন দপ্তর খোলা যাবেনা। ভিন্ন মতের কোনো জায়গা নেই। কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে কোনো সরকারী কর্তৃপক্ষ/আধিকারিক কথা বলবেন না, আলোচনা করবেন না। কর্মচারীদের কনফারমেশন, গ্রেডেশন, ফাংশনাল, ননফাশনাল প্রেমোশন, ন্যায়সংগত প্রাপ্য অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিয়ে দরবারের, সমাধানের কোনো পথ নেই। আবেদন, অভিযোগ মাসের পর মাস পড়ে আছে, নিষ্পত্তির কোনো বন্দোবস্ত নেই। অদৃশ্য ফতোয়া জারি আছে, করা যাবে না কোনো আন্দোলন। নিয়োগকর্তা সরকারের হৃদয়হীন মনোভাব আর নিপীড়নকারি চরিত্রের কোনো সমালোচনা করা যাবে না, এটাই গণতন্ত্র।

শুধু তাই নয় ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি এই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী উন্মোচিত হয়েছে যার কোনো পূর্ব নজির নেই। ২০১২ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট আর ২০১৩ সালে ২০-২১ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটে আমাদের অভিজ্ঞতা কি? সারা দেশজুড়ে শ্রমজীবী জনগণ তাদের কতগুলি বুনিয়াদী দাবি নিয়ে ধর্মঘট করেছেন যে ধর্মঘটের দাবিগুলির ব্যাপারে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং আহ্বায়ক সংগঠনগুলির নেতাদের বলেছিলেন 'আপনাদের অনেকগুলি দাবি সংগত'। সেই ধর্মঘট ভাঙ্গবার জন্য তৎকালীন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী বলেছিলেন সরকারী কর্মচারীরা কোনো ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে না, তাদের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নেই। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ধর্মঘটের আগের দিন ব্রেক-সার্ভিস (চাকুরিচ্ছেদ)-এর হুমকি দিয়েছিলেন।

দেশ জোড়া ধর্মঘটে আর কোনো মুখ্যমন্ত্রী এমন হুংকার দেননি। শ্রমিক-দরদী গণতান্ত্রিক সরকারের এ কী আচরণ! শুধু কি তাই? অসুস্থ, মাতৃ ত্বকালীন ছুটিতে থাকা কর্মচারীদের 'শো-কজ' করা হয়েছে। আধিকারিকরা গাড়ি পাঠিয়ে টেলিফোন করে কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে অফিসে আসতে বাধ্য করেছেন। যাঁরা ধর্মঘট করেছেন তাদের 'শো-কজ' করে একদিনের বেতন কেড়ে নিয়ে 'ডায়েজ নন' করা হয়েছে। হুমকি দিলেও কর্মচারীদের 'ব্রেক অফ সার্ভিস' বা চাকরিচ্ছেদ ঘটানো যায়নি। বহু লড়াই-এর মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গ কৃত্যক (সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্বসমূহ) বিধি ১৯৮০ অনুযায়ী ৪ নং ধারায় ধর্মঘটের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই ধর্মঘট ১৯৪৮ সালের শিল্পবিরোধ আইনে বিধৃত ধর্মঘটের অনুরূপ। ফলত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এই ধর্মঘটকে বে-আইনী করা যাবে না। এই বিধি বাতিল না করে কর্মচারীদের স্থায়ী অর্জিত অধিকারগুলি (কনফার্মেশন, প্রোমোশন, সি এ এস/এস সি এস)ইত্যাদি সুযোগ কেড়ে নেওয়া যবে না। ডায়েজ-নন করে চাকুরিকালের একটি দিন কমানো ছাড়া। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, ব্যাংক, বীমা, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী বা অন্য রাজ্যে রাজ্য সরকারী কর্মচারী — কাউকে এমন ঘটনার মুখোমুখী হতে হয় না। তাই কি এই সরকার কর্পোরেটকুলের এত প্রিয়ভাজন?

সারা রাজ্য জুড়ে রাজ্য প্রশাসনের অভ্যন্তরে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কর্মচারী, আধিকারিকদের বিপুল অংশ তাঁরা নিরুচ্চার। এক অব্যক্ত যন্ত্রণা সকলকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কেউই তার অসুবিধার কথা, সমস্যার কথা মুখ ফুটে, প্রকাশ্যে বলতে পারছেন না। চার দেওয়ালও যেন শত্রু সেজে গোপন কথা ছিনিয়ে নিতে পারে — এই আশংকা প্রবল। রাজ্য সরকার ব্যবহার করছে একাংশের লুব্ধ আধিকারিকদের। ব্যবহার করা হচ্ছে বদলীকে। যাঁরা মুখ খুলছেন, প্রকাশ্যে বিরোধিতা করছেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন তাদের দূর-দূরান্তরে বদলী করা হচ্ছে। বদলীর নীতি লঙঘন করে, নির্বিচারে, প্রতিশোধমূলক মনোভাব থেকে প্রতিবাদীদের নির্মূল করে নিপীড়নের বুলডোজার চালাতে। ছা-পোষা, মাস মাইনের বাঁধা কর্মচারী যাতে

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

১৩ আগস্ট রানি রাসমণি এভিনিউতে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশের একাংশ।

আসুন আমরা নচিকেতা হই

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

আত্মসমর্পণ করে। নতশিরে মুখ বুজে মেনে নেয় সব পীড়ন। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের সাহস ও সংগ্রামী স্পৃহাকে অত সহজে দমানো যায়না। ২০১৩ সালের ধর্মঘটে ধর্মঘটী কর্মচারীদের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। ন্যায় সংগত, বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন কর্মচারী সমাজ। ধীরে ধীরে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের অন্তর্নিহিত শক্তি বেগবান হয়ে উঠছে। তাই হুমকি 'রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙ্গে দাও'। সত্তর দশকে এই হুমকি দিয়েছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর পূর্বসূরী তৎকালীন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়। ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রেখেছে ঘটনাবলীর পরিণাম।

শুধু ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, গণতন্ত্রের উপর বল্গাহীন আক্রমণই নয়, বিগত সরকারের আমলে বেরিয়েছে অজস্র আদেশনামা — যা কেড়ে নিয়েছে / নিচ্ছে আমাদের বহু আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অর্জিত সুযোগ সুবিধা। দু-একটি নমুনা তুলে আনা যেতে পারে। ১৯৭৯ সালে প্রণীত পশ্চিমবঙ্গ কৃত্যক (নিয়োগ, আরক্ষা এবং সন্নিয়োগ) বিধি '৭৯-র সুযোগ। চাকরির তিন বছর অন্তে কনফার্মেশন-এর সুযোগ কেড়ে নিয়ে এ্যাবজরবশান্ এর সুযোগ দেওয়া হয়েছে শর্তাধীন ৩ বছর চাকরি পর। তদুপরি বেতন হবে অর্ধেক। এই তিন বছর চাকুরিকাল চাকুরিগত সুবিধা হিসাবে গণ্য হবে না।

মৃত কর্মচারীর পরিবারের চাকরি আজ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কোথাও কোথাও পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়া হয়েছে চুক্তিতে। হাজার হাজার স্থায়ী পদ শূন্য। কোনো স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি নেই। পঞ্চায়েত, গ্রাম-উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ — সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনে নাভিশ্বাস উঠেছে। কর্মীদের উপর কাজের বোঝা দ্বিগুণ-তিনগুণ। সরকারী আদেশনামা, নির্দেশাবলী গুটি কয়েক আধিকারিকের কাছে সীমাবদ্ধ। চালু হয়েছে ই-গর্ভন্যান্স। কর্মচারী - আধিকারিকরা ব্রাত্য। ফলে পরিষেবা প্রদানে প্রশাসনিক পরিচালনার কাজে কর্মচারীদের ভূমিকা নস্যাৎ হয়ে যেতে বসেছে। কর্মচারীদের মর্যাদা আজ ধূলায় লুণ্ঠিত।

নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, পরিষেবার চড়া মাশুল, স্বাস্থ্য, শিক্ষার ক্রমাগত বে-সরকারীকরণের ফলে জনসাধারণসহ মধ্যবিত্তের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে জীবন-যাপনের ব্যয়ভার। বেতনের ক্ষয় ঘটছে ক্রমাগত। অসাম্য বেড়েছে। জীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ কর্মচারী সমাজ। তাই মহার্ঘ ভাতা প্রদান ও বেতনবৃদ্ধির জন্য বেতন কমিশন গঠন অপরিহার্য।

নবান্নকে কয়েদখানা বানিয়ে রাজ্যের গোটা কর্মচারী সমাজকে সন্ত্রস্ত করতে চেয়েছে শাসকশ্রেণী, তা হবে না। হয়নি কোথাও কোনোদিন।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ তিন দশকের কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাস রক্তাক্ত, অগ্নিবর্ষী। রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের কাছে নতিস্বীকার করেনি কোনোদিন কর্মচারী সমাজ।

সে ইতিহাস আমরা ভুলিনি। শুধু সত্তর দশকেই বিনা বিচারে আটক হয়েছিলেন ৩৩ জন রাজ্য সরকারী কর্মচারী। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে সংবিধানের ৩১১ ২(গ) ধারায় রাজ্যপালের বিশেষ ক্ষমতাবলে বরখাস্ত হয়েছিলেন ২৯ জন কর্মচারী। মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার হন ৩০ জন। ধর্মঘটের দিনগুলিতে, বিভিন্ন মিছিল ও সমাবেশে গুন্ডাদের আক্রমণে ৪২১ জন সরকারী কর্মচারী মারাত্মক ভাবে জখম হয়েছিলেন। কংগ্রেসীদের মদত পুষ্ট সমাজবিরোধীদের আক্রমণে বাড়ী ছাড়া হয়েছিলেন ৩৫০০ কর্মচারী। ধর্মঘট ও গণ অবস্থানে অংশ নেওয়ার জন্য কর্মচারীদের ৩১ দিনের বেতন কাটা গেছে বা ব্রেক সার্ভিস হয়েছে। সেদিনও চূড়ান্ত প্রতিশোধমূলক মনোভাব থেকে সরকার নিয়ম-কানুন ভেঙে ৪০০০ কর্মচারীকে বদলী করেছিল। সারা রাজ্য জুড়ে ভয়ংকর তান্ডব আর রাষ্ট্রীয় দমন — পীড়নের ইতিহাস তুলে আনলে তা হবে মহাভারত। তবুও কি আন্দোলন দমানো গিয়েছিল? রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া গিয়েছিল? উটপাখির মত মুখ গুঁজে নয়, নতশির, ভগ্নজানু হয়ে নয়, কর্মচারী আন্দোলন মাথা তুলেছিল মহীরুহের মত। জনগণের সঙ্গে যুক্ত আন্দোলন তৈরি করেছিল পশ্চিমবাংলায় এক নতুন ইতিহাস। অবশেষে অবসান ঘটেছিল সেই অমানিশার।

আজ যে ৪টি বেতন কমিশন, উন্নত বেতন-কাঠামো, প্রোমোশনের সুযোগ, চাকুরি-অন্তে পূর্ণ পেনশনের সুবিধা আর ছিটেফোঁটা আত্মসম্মান নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, কি করে ভুলে যেতে পারি তার জন্য মানস ঘোষ, গোপাল বাগচী, অনিল কর্মকার, নগেন সরকার, মতি শীল, সুধাংশু করগুপ্ত, সত্যেন সরকার, শেখ ইউনিস, শচীনন্দন মুখার্জী, বিনয় মান্নাদের কথা। ৬০ জন শহীদ রাজ্য সরকারী কর্মচারী, তাঁদের খুনে রাঙা হয়েই কর্মচারী জীবনে নতুন সকাল এসেছিল, এসেছিল সেই সব ঐতিহাসিক সাফল্য — যার স্বাদ আজও জিহ্বায় লেগে আছে।

সুতরাং ভয় নেই বন্ধু। আসন্ন ২ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে সফল ধর্মঘটের জন্য শ্রমজীবীদের যে উত্তাল আন্দোলনের তরঙ্গ তৈরি হচ্ছে কর্পোরেটমুখী অর্থনীতির বিরুদ্ধে, সেই তরঙ্গে উদ্বেলিত হোক পশ্চিমবাংলায়ও। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জরুরী ৯ দফা দাবিতে আবার তুফান উঠুক, জাঙাল ভেঙ্গে জনবিরোধী, দুর্নীতিগ্রস্ত লালফিতা বাঁধনে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাঁধা আমলাতান্ত্রিক অচলায়তন দুমড়ে, হুমকি সংবলিত সার্কুলার-এর পাহাড় ডিঙিয়ে। ধর্মঘট একমাত্র ধর্মঘটই যা শাসক শ্রেণীকে প্রবল আঘাত করে। শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের ব্রহ্মাস্ত্র সেই ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করে মনের জ্বালা জুড়োই। যুক্ত আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক অধ্যায় তৈরি হয়েছে আজ। ৩৫টি উদ্যোক্তা সংগঠন, সমর্থক ৩টি সংগঠন ঐক্যবদ্ধভাবে ডাক দিয়েছে ধর্মঘটের। আরও সংগঠন হাত বাড়াবে এগিয়ে আসার। সব বাধা, অপপ্রচার, আক্রমণ ঠেলে আসুন আজ আমরা নচিকেতা হই। □

স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান দিবস

মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতিমণ্ডলী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথাগুলি বলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ-র আহ্বায়ক মনোজ কান্তি গুহ। বিগত ১৩ আগস্ট ২০১৫ মুখ্যসচিবের নিকট আগামী ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটের সমর্থনে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে মনোজ কান্তি গুহ আরও বলেন এই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত সংগঠনগুলিকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। সেখানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বলিষ্ঠ ভাবেই সরকারী কর্মচারী এবং জনগণের স্বার্থে গৃহীত সমস্ত কাজেই সরকারকে সহযোগিতা করার কথা বলা হয়। পরবর্তীতে আরও দু-একটি সভা হলেও দীর্ঘ প্রায় সাড়ে তিন বছর মুখ্যমন্ত্রী আর সংগঠনগুলির সঙ্গে দেখা করছেন না, শুধুমাত্র নিজদলের অনুগামী সংগঠন ছাড়া। একদিকে বর্তমানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মেলা উৎসবের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে, ক্লাবগুলিকে আর্থিক অনুদানের নামে কোটি কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে অপরদিকে পরিবহন শ্রমিকরা সময়ে বেতন পাচ্ছেন না, পেনশনের টাকাও অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে, অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে, মহার্ঘভাতার বকেয়া বাড়তে বাড়তে আজ ৪৮ শতাংশে ঠেকেছে পরিমাণে যা একজন গ্রুপ-ডি কর্মচারী ক্ষেত্রে ৩৩০০ টাকার ওপর, একজন গ্রুপ-সি কর্মচারীর ক্ষেত্রে ৪৮০০ টাকার ওপর। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির দাপটে সাধারণ জনগণের সঙ্গে রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা নিদারুণ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা দীর্ঘদিনের লড়াই-আন্দোলনের ফসল মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কেন্দ্রীয় হারে স্বীকৃত মহার্ঘভাতার পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন গঠিত এবং সেই কমিশনের সুপারিশ চূড়ান্ত হতে চললেও বর্তমান রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠনের ব্যাপারে অদ্ভুত নীরবতা প্রদর্শিত হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসনে, বিধিবদ্ধ সংস্থায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে লক্ষ লক্ষ স্থায়ী পদে স্থায়ী ভাবে নিয়োগ না করে অবসর প্রাপ্ত, অনুগ্রহপুষ্ট কর্মীদের চুক্তি প্রথায় নিয়োগ করা হচ্ছে। পি এস সি সহ পরীক্ষা গ্রহণকারী স্বয়ংশাসিত সার্ভিস কমিশনগুলির অধিকার খর্ব করে স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগের ব্যাপারে বেকার যুবক-যুবতীদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। ওয়ার্কচার্জড্ এবং চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের প্রসঙ্গটি রাজ্য সরকার অবহেলা করে চলেছেন। শিক্ষার অধিকার আইন রূপায়ণের নামে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের কর্মচ্যুত করা হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে চলছে এক চরম নৈরাজ্যের পরিবেশ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে সমাজবিরোধীদের দাপাদাপি চলছে। গোটা রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা যখন রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আক্রমণের শিকার তখন দেশের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকার মালিক শ্রেণীর স্বার্থে আইন সংশোধনের নামে শ্রমিকদের বুনিয়াদী অধিকারগুলি কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছে। চুক্তিপ্রথায় ও অস্থায়ী পদে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যূনতম ১৫০০০ টাকা মজুরির দাবি অস্বীকৃত হচ্ছে। এই পটভূমিতে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং জাতীয় ফেডারেশনগুলি আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ দেশব্যাপী একদিনের ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছেন। পশ্চিমবাংলার শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যৌথমঞ্চ এই ধর্মঘটকে সমর্থনের সাথে সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে নিজস্ব দাবিগুলিকে যুক্ত করে আলাদা করে ৯ দফা দাবিকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিবের নিকট ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করবে বিধি অনুযায়ী ধর্মঘটের ১৪ দিন আগেই। রাজ্য সরকারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা একারণে যে ১৯৭০ সালে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে কর্মচারীদের নিজস্ব দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট আহূত হওয়ার ৪৫ বছর পর এতগুলি সংগঠন মিলে পুনরায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে এবং অর্জিত অধিকার হরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটে শামিল হচ্ছেন। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী নবান্নতে যৌথমঞ্চের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে মুখ্যসচিবের নিকট ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করতে যাওয়া হয়েছিল বেলা ১টার সময়। কিন্তু এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার কোনো পরিবর্তন ঘটল না। পুলিশের পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দকে প্রায় ব্যারিকেড করে মুখ্যসচিবের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ১৩তলায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু মুখ্যসচিবের পক্ষ থেকে ধর্মঘটের নোটিশ গ্রহণের সৌজন্যটুকুও দেখানো হয়নি যা বর্তমান সরকারের মানসিকতার সঙ্গে পরিপূরক। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করেন না, চিঠি পাঠালে প্রাপ্তি স্বীকারটুকুও করেন না। ফলে মুখ্যসচিবের অফিসে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান এবং তার প্রাপ্তি স্বীকার করে নেতৃবৃন্দ জমায়েতে এসেছেন। আজকের যে যৌথমঞ্চ গঠিত হয়েছে তার সূচনা হয়েছিল মুসলিম ইনস্টিটিউট হলের কনভেনশন থেকে। পরবর্তীতে ১৫টি সংগঠনের পক্ষ থেকে কনভেনশন এবং ১১ই ডিসেম্বর থেকে ধর্মতলায় ওয়াই চ্যানেলে লাগাতার দিন-রাত্রি ব্যাপী গণঅবস্থান কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ডঃ সূর্যকান্ত মিশ্র এই গণঅবস্থানে উপস্থিত হয়ে কর্মচারী আন্দোলন ও দাবিগুলির প্রতি সমর্থন জানান এবং অনুরোধ জানান এই অবস্থান কর্মসূচী তুলে নেওয়ার জন্য কারণ বর্তমানে যে রাজ্য সরকার প্রশাসন চালাচ্ছে তাদের নিজের সরকারী কর্মচারীর প্রতি কোনো দায়-দায়িত্ব, দায়বদ্ধতা নেই। পরবর্তীতে মহামিছিলের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল রানি রাসমনি রোড থেকে হাজরা পার্ক পর্যন্ত। নিজস্ব দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ৪ দিন ধরে দপ্তরে দপ্তরে পোস্টার পরিধান কর্মসূচী পালন করা হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে। কিন্তু এই সরকারের কোন হেলদোল নেই। তাই এ মুহূর্তে রাজ্য সরকারী কোষগার থেকে বেতনপ্রাপ্তদের ৩৫টি সংগঠন একযোগে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকারের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে লাড়াই আন্দোলনে শামিল হওয়ার। যৌথ কনভেনশন থেকে ধর্মঘটের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ শুধু নয় সমস্ত সংগঠন যৌথমঞ্চে একত্রিত হয়ে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করেছে যা এককথায় নজির বিহীন। ইতিমধ্যে জেলাস্তরে যৌথমঞ্চ গঠন ও জেলা স্তরে কনভেনশন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই কনভেনশনগুলিতে যৌথমঞ্চের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। একে কেন্দ্র করে জেলা স্তরে ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকটি জেলায় জেলা শাসকদের নিকট এদিনই যৌথমঞ্চের পক্ষ থেকে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করা হচ্ছে, আগামীতে একে কেন্দ্র করে পথসভা হবে, আগামী ২৮ আগস্ট '১৫ অফিস ছুটির পর রানি রাসমণি রোড থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচী হিসাবে মহামিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার প্রস্তুতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জেলাস্তরে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে ধর্মঘটের সমর্থনে।

ধর্মঘটকে ব্যর্থ করার জন্য বর্তমান প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুনরায় হুমকি দেওয়া হবে, Break of Service এবং Dies Non এর কথা পুনরায় মিডিয়ার পক্ষ থেকে প্রচার করা হবে যা ২০১২ এবং ২০১৩ সালের ধর্মঘটের আগে প্রচার করা হয়েছিল। ২০১২-র ২৮ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটের আগের দিন মুখ্যমন্ত্রীর Break Service-এর হুমকির কথা আমাদের মনে আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যতদিন WBSR-এ ধর্মঘটের আইনি স্বীকৃতি আছে ততদিন সরকারের পক্ষ থেকে যতই চেষ্টা করা হোক Service Break হবে না। Dies Non মানে একদিনের জন্য চাকুরীর সময়কাল কমে যাওয়া যা Past Service এ কোন প্রভাব ফেলে না। শুধুমাত্র সরকার একটি দিনের বেতন কাটতে পারে, এককথায় "No work - No Pay" পুরোনো সরকারের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বর্তমান সরকারের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির এটাই পার্থক্য যে এরা ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে ধর্মঘটকে ব্যর্থ করতে চায়, WBSR এ ধর্মঘটের আইনি স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও নূতন প্রজন্মের কর্মচারী যাঁদের এ অভিজ্ঞতা ছিলনা তারাও ধীরে ধীরে বুঝতে পারছেন তাই ধর্মঘটীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যতই

(সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্মচারীদের সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী ২ সেপ্টেম্বর যে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা শুধু কর্মচারীদের কাছেই নয় তা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে এক বিশেষ বার্তা নিয়ে যাবে যা আগামী দিনের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের পথ প্রসারিত করবে। ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল এই যে, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি শুধু মাত্র তাদের নিজস্ব দাবি দাওয়াই নয়, জমি বিল প্রত্যাহারের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও ধর্মঘটের দাবি হিসেবে যুক্ত করেছে। তাই এই ধর্মঘট শ্রমিক কৃষকের এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে রূপান্তরিত হবে।

সভার প্রধান বক্তা, সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বাসুদেব আচারিয়া তাঁর ভাষণে বলেন, এই পঞ্চাশ বছরে, ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে বহু মানুষ সংগঠিত হয়েছে। ১৯৬৬ সালে যখন ১২ই জুলাই কমিটি গঠন হয় তখন পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি উত্তাল। একটার পর একটা গণসংগঠন তৎকালীন রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিল। খাদ্য আন্দোলন থেকে শুরু করে মানুষের আন্দোলন, শিক্ষকদের আন্দোলন, সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন, শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সব মিলিত হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৬৭ সালে রাজনৈতিক পরিবর্তন, যাতে অন্যতম ভূমিকা নেয় এই ১২ই জুলাই কমিটির নেতৃত্বে যৌথ আন্দোলন। ১৯৭৬ সালের ২১ দিনের রেল ধর্মঘট, তাকে সফল আখ্যায়িত করা হয় এই কারণে যে, যদিও এক দফা দাবিও সেদিন পূরণ হয়নি, কিন্তু এই ধর্মঘটের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং ১৯৭৭ সালে দেশে রাজনৈতিক পালা বদলের অন্যতম কারিগর ছিল এই রেল ধর্মঘট। তবে কেন্দ্রে সরকার বদলালেও নীতির কোন পরিবর্তন হয়না। ১৯৯১ সালের পর থেকে কেন্দ্রে বহু সরকার আসীন হয়েছে। ১৯৯১ সালে নরসিমহা রাও সরকার যে উদারবাদী নীতি ঘোষণা করেছিলেন, আজকের সরকারও একই নীতি কার্যকর করে যাচ্ছে। ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রের শিল্প সম্পর্কিত প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিল রাষ্ট্রিয়করণ। বৃহৎ শিল্পগুলি বেসরকারী ব্যক্তি মালিকাধীন থাকবে না। এই নীতির অন্যতম সমর্থন যোগ্য বিষয় ছিল আত্মনির্ভরতা। তাই সেদিন যখন ইস্পাত শিল্পে প্রযুক্তি প্রদানের নামে আমেরিকা নীতি পরিবর্তন করার প্রস্তাব দিয়েছিল তখন আমাদের দেশের নেতৃত্ব তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এর প্রধান কারণ ছিল যে আমাদের পেছনে ছিল সোভিয়েত সামাজতান্ত্রিক দেশের সমর্থন। ১৯৯১ সালের পর বিগত আড়াই দশকে পরিবর্তিত নীতির ফলে কি সত্যিই আমাদের দেশ এগিয়েছে। দেশের সব সমস্যার কি সমাধান হয়েছে। সাম্প্রতিক একটি সেনসাস রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে, আজ ভারতবর্ষের ৫০% জনগণ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। কর্মক্ষেত্রে অসংগঠিতে ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করা মানুষের সংখ্যা যেমন বাড়ছে, তেমন বাড়ছে কোটি পতিদের তালিকায় থাকা মানুষের সংখ্যাও। তাই ধনী গরিবের তফাৎটাও সাথে সাথে বাড়ছে। কিছু মানুষের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। যদিও সংবিধানে বলা আছে যে দেশের সম্পদ কোন একজন মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হবে না। আজ দেশের একশজন বিলিওনিয়ারের হাতে দেশের ২০ ভাগ সম্পদ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আর বাকি ৮০ ভাগ ১২০ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের হাতে। ১৯৯১ সালের প্রণীত নীতির ফলেই আমাদের দেশে এই দারিদ্র, বেকারি, অনাহার বেড়েছে। উদারবাদী পুঁজিবাদী নীতিই ভারতবর্ষের সর্বনাশের নীতি। যে নীতি ভারতবর্ষে কর্পোরেট হাউসের জন্ম দিয়েছে তার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। তাই আজ নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন। আর তা করতে গেলে যারা এই নীতির প্রবক্তা তাদের ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। অতীতের সেলফ-রিলায়েন্স নীতি থেকে সরে এসে এখন এরা রিলায়েন্স বা কর্পোরেট-রিলায়েন্স নীতি রূপায়ণ করছে। পুঁজিবাদী নীতির আগ্রাসনের ফলে আজ দেশের শিল্প, কৃষি সঙ্কটাপন্ন। শ্রমিক তার কাজ হারাচ্ছে। কৃষক আত্মহত্যা বাড়ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বীজ সংস্থাগুলির পরিবর্তে বিদেশী বীজ কোম্পানিগুলি আমাদের দেশ থেকে বিগত নয় বছরে ৪৭ হাজার কোটি টাকা লুট করে নিয়ে গেল। এই টাকা ভারতবর্ষের ১২৭ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষের টাকা। এই সময়কালে বামপন্থীরা সংসদের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী পুঁজি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের বিলগুলি আটকানোর নিরন্তর লড়াই করে গেছে। কারণ এই সম্পদ দেশের মানুষের সম্পদ। আজ প্রধান আক্রমণ নেমে এসেছে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর ওপর। ১৯৯১ সালের পর থেকে বিদেশী ব্যাঙ্কে পুঁজিভূত কালো টাকার পরিমাণ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে এই কালো টাকা নিয়ে দেশবাসীকে অনেক আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর এর আর কোন উল্লেখ তার মুখে শোনা যায় না। ১৯৯১ সালের আগে শ্রমিক-কর্মচারী ভাবতে পারেনি যে তাদেরকে ন্যায্য পেনশন থেকে বঞ্চিত হতে হবে। শ্রম আইনকে পরিবর্তন করে আরো বেশী করে পুঁজিপতি মালিকের স্বার্থবাহী করার প্রচেষ্টা চলছে। আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের উল্লঙ্ঘন হচ্ছে। হরিয়ানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অপরাধে আজ সাড়ে তিন বছর ধরে মারুতি কোম্পানির ১৪৭ জন শ্রমিক জেলে বন্দী অবস্থায় পড়ে আছেন। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কর্পোরেট হাউসগুলি ১৭ হাজার কোটি টাকা খরচা করে বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে। এর প্রতিদানে সরকার একের পর এক কর্পোরেট স্বার্থবাহী জনবিরোধী নীতি প্রণয়ন করে যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম কয়লা শিল্পকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা। কর্পোরেট ট্যাক্স ৫ শতাংশ কমিয়ে তাদের মাথা থেকে ২৬ হাজার কোটি টাকার বোঝা নামিয়ে আনা হল। উল্টোদিকে দেশের সাধারণ মানুষের ওপর ২৪ হাজার কোটি টাকার পরোক্ষ কর চাপিয়ে দেওয়া হল। এর থেকেই বোঝা যায় সরকার কোন পথে, কোন নীতিতে চলছে। সুকৌশলে ভারতীয় রেলকে বেসরকারীকরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণী লড়াই চলিয়ে যাচ্ছে। কয়লা শিল্পে শ্রমিকরা ধর্মঘট করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে শ্রমিক শ্রেণী অন্যায়ের সামনে মাথা নত করবে না। এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে কৃষক, সাধারণ মানুষের যে আক্রোশ তা প্রতিফলিত হবে আগামী ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটে। আমাদের পৌঁছাতে হবে প্রতিটি মানুষের কাছে তাঁর সমর্থন আদায়ের জন্য। রাজ্যের পরিস্থিতি কোন আলাদা কিছু নয়। এরাও শ্রমিক, কর্মচারী, কৃষক ও সাধারণ মানুষকে তাদের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তাই এই নীতির পরিবর্তন করতে হলে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে নীতি প্রণয়নকারীদের ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে। আর এর প্রথম ধাপ হবে ২ সেপ্টেম্বরের ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট।

অনুপ চক্রবর্তী, স্বপন চক্রবর্তী ও মীরা ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী এই সভা পরিচালনা করেন। □

মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান দিবস

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

হুমকি দেওয়া হোক — এভাবে সংগঠন ভাঙ্গা যাবে না ধর্মঘটকে আমরা সাফল্যমণ্ডিত করবই-করব। যৌথ আন্দোলনের ক্ষেত্রে নজিরবিহীন ঘটনা-৩৫টি উদ্যোক্তা সংগঠন প্রত্যেকেই সিরিয়াস। প্রত্যেকটি সংগঠন একযোগে সই করেছে। কর্মচারী আন্দোলন তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় রচিত হল। ধর্মঘটের পরবর্তীতে যদি কোন ফলাফল না হয় তাহলে পরবর্তীতে আরও বৃহৎ আন্দোলনে যেতে হবে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই সরকারকে দাবিপূরণে বাধ্য করতে হবে, ২ সেপ্টেম্বরে আমরা সকলে ঐতিহাসিক ধর্মঘটে শামিল হব, রাজ্য প্রশাসন স্তব্ধ হয়ে যাবে।

পরবর্তীতে যৌথমঞ্চের উদ্যোক্তা সংগঠনগুলির মধ্যে এবিটিএ-র পক্ষে উৎপল রায়, এবিপিটিএ-র পক্ষে সমর চক্রবর্তী, জয়েন্ট কাউন্সিলের পক্ষে অমিত সরকার, যুক্ত কমিটির পক্ষে দীপঙ্কর বাগচী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে শুভাশীষ দাস, আইএনটিইউসি-র পক্ষে মলয় মুখার্জী, নার্সেস ইউনিটির পক্ষে ভাস্বতী মুখার্জী, অল বেঙ্গল প্যারা মেডিক্যাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষে রেখা গোস্বামী সহ স্টিয়ারিং কমিটি, ইউনিট ফোরাম, সারা বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি, পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্ক মেন্স ইউনিয়ন ও কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স এন্ড অ্যালায়েড সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধর্মঘটের দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখা হয়। সকল বক্তাই রাজ্যজুড়ে নৈরাজ্যের অবসানের লক্ষ্যে, কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষকর্মী-পরিবহন কর্মচারী-মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীর ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আগামী ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটকে সফল করতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃত্ব জীবন সাহার ওপর আক্রমণের নিন্দা যৌথমঞ্চের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে করা হয়। উদ্যোক্তা সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে লড়াই আন্দোলনের যৌথমঞ্চ গঠনে সর্বাধিক ভূমিকা গ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়।

সমাবেশের শুরুতে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মধ্যাঞ্চল সাংস্কৃতিক শাখার পক্ষ থেকে গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথমঞ্চের আহ্বানে এই সমাবেশ পরিচালনা করেন অশোক পাত্র, ভি কে শ্রীবাস্তব, মীরা ঘোষ, রুইদাস সাহারায়, কুন্তল কান্তি মণ্ডল, বিজলী মিত্র, মোস্তাক মুর্শেদ, কাপালী কাবাসী, মৃণাল দাস, অঞ্জন ঘোষ, পার্বতী পাল, শান্তি ঘোষ, সুদীপ নারায়ণ গোস্বামী, মলয় মুখার্জী, তপন দে, নির্ভীক মজুমদার ও রাধারমণ দত্তকে নিয়ে গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী।

ধর্মঘটের উদ্যোক্তা ৩৫টি সংগঠন

● রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ● এ বি টি এ ● এ বি পি টি এ ● আই এন টি ইউ সি ● জয়েন্ট কাউন্সিল ● যুক্ত কমিটি ● স্টিয়ারিং কমিটি ● পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন ● পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ ওয়ার্কম্যানস ইউনিয়ন ● পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি ● কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ● অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কম্যানস ফেডারেশন ● পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন ● ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● ইউনিটি ফোরাম ● জয়েন্ট কাউন্সিল অব এ্যাকশন অব ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ● সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি ● সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ● কে এম ডি এ এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন ● বি পি টি এ ● বি টি ই এ ● পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ ● প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ ● কে এম সি মজদুর ইউনিয়ন ● কে এম সি ক্লার্কস ইউনিয়ন ● কে এম সি ইঞ্জিনীয়ার্স এন্ড এ্যালায়েড সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন ● পৌর শিক্ষক ও কর্মী সংঘ ● পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক সমিতি ● অল বেঙ্গল প্যারা মেডিক্যাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ● নার্সেস ইউনিটি ● পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্মচারী সমিতি ● পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক পর্ষদ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এর নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা জমায়েত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন। □

— দেবাশীষ রায়

কমরেড ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

পশ্চিমবঙ্গ সাব অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোশিয়েশন-এর উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবারেও কমরেড ইন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হলো কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে **৪ আগস্ট ২০১৫ সন্ধ্যায়।** দিনটি কমঃ চট্টোপাধ্যায়র ৬ষ্ঠ মৃত্যুদিন হলেও স্মারক বক্তৃতাটা ৫ম অর্থাৎ মৃত্যুর ১ বছর পর থেকেই এই স্মারক বক্তৃতা চলে আসছে সমাজের বিভিন্ন প্রসঙ্গ সহ সমসাময়িক জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাকে ধারণ করে নিজেদের শিক্ষিত পুনঃশিক্ষিত করে তোলার লক্ষেই। এবারের ৫ম স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল, **'বর্তমান সময়ে মিডিয়া ও সোস্যাল মিডিয়া এবং মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের সংগঠন আন্দোলনে তার চর্চা ও প্রয়োগ।'** আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবাশীষ চক্রবর্তী।

স্মারক বক্তৃতার সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রভঞ্জন ঘোষ। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র পাল। ভ্রাতৃপ্রতীম সদস্যসহ প্রায় ১০০র কাছাকাছি সদস্য বন্ধু সভায় শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিল।

আলোচক তাঁর আলোচনায় সোস্যাল মিডিয়া এবং চিরাচরিত মিডিয়ার মধ্যে মৌলিক তফাৎগুলি চিহ্নিত করে বলেন যে 'গোটা সমাজটা ... সোস্যাল মিডিয়া পরবর্তী সমাজ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে।' সোস্যাল মিডিয়ার বিপুল বৃদ্ধির মৌলিক কিছু গুণাবলীর উল্লেখ করে দেখান যে, সোস্যাল মিডিয়া এমন ধরণের জমায়েত আন্দোলন সমাবেশে মতামত প্রদান বা বন্ধুত্বের বিস্তৃতিতে বিপুল ভাবে কার্যকরী থাকে যেখানে প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতি কোন বিরোধিতা নেই। আক্রান্ত হবার ঝুকি না থাকার। ফলে তা শিথিল সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে চলে। কিন্তু যেখানে প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন করা দরকার সেখানে আন্দোলনকারীদের পারস্পরিক সম্পর্কে অনেক বেশি দৃঢ়তা থাকতেই হবে। কাজেই শ্রমজীবী মানুষের আন্দালনে পরিচিত গন্ডির বাইরে বৃহৎ অংশের মানুষের সাথে ভাবনার আদান প্রদানের যে গণতান্ত্রিক ও প্রান্তরিক সুযোগ সোস্যাল মিডিয়ায় আমাদের সামনে আছে তাকে ধারাবাহিক, পরিকল্পিত এবং দৃঢ়বদ্ধ নীতির উপর ভিত্তি করেই চালানো প্রয়োজন। তবে আদিমতম মিডিয়া অর্থাৎ ব্যক্তিগত যোগাযোগ কিন্তু অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আলোচনাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হবে। □

২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটের সমর্থনে জলপাইগুড়িতে সাধারণ সভা

১১ টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ৫৫টি সর্বভারতীয় ফেডারেশনগুলির আহ্বানে ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সাধারণ ধর্মঘট সেই সাথে এক-ই দিনে ৯ দফা দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত, শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ আহূত ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে গত ১৬ আগস্ট একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের ৬ শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তপন মৈত্র, গোপাল দাস, কান্তি ঘোষ ও সুখেন্দু বিশ্বাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী সভার কাজ পরিচালনা করেন। সভায় সংগ্রামী হাতিয়ারের প্রাক্তন সম্পাদক তথা কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায় ধর্মঘটের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তার বক্তব্য উপস্থিত সকলকে উদ্দীপ্ত করেছে। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
44th Year, 4th Issue, August 2015

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

১৩ আগস্ট ২০১৫

জেলায় জেলায় স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান

বর্ধমান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ, বর্ধমান জেলার পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যসচিবের নিকট প্রেরিত স্ট্রাইক নোটিশের অনুলিপি বর্ধমান জেলায় গত ১৩ আগস্ট, ২০১৫ প্রদান করা হয়। জেলা যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বেলা ২টোয় জেলা শাসকের প্রতিনিধি হিসাবে অতিরিক্ত জেলা শাসক (পঞ্চায়েত) নোটিশের অনুলিপি গ্রহণ করেন।

ওইদিন বিকাল ৫.৩০টায় বর্ধমান শহরের মনিমার্টে পাঁচ শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান উপলক্ষে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল কালাম, প্রণব আইচ ও বলাই চন্দ্র সরকার। সভায় স্ট্রাইক নোটিশ উত্থাপন করেন বর্ধমান জেলা যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বর্ধমান জেলা শাখার সম্পাদক বিশ্বনাথ দে। পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান জেলা যৌথ মঞ্চের অন্যতম নেতৃত্ব তথা এবিটিএ-র বর্ধমান জেলা সম্পাদক সুদীপ্ত গুপ্ত। □

উত্তর দিনাজপুর

উপরোক্ত কর্মসূচী উত্তর দিনাজপুর জেলা সদর রায়গঞ্জে প্রতিপালন করা হয়। জেলা সমাহর্তার করণের নিকট শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জমায়েত করে কর্মসূচীটি হয়। সেখানে স্ট্রাইক নোটিশ পাঠ সহ ধর্মঘটের সমর্থনে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়। পরে উপস্থিত ৮টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে অতিরিক্ত জেলা শাসকের (সাধারণ) হাতে স্ট্রাইক নোটিশ তুলে দেন। জমায়েতে দুই শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন ভানুকিশোর সরকার ও মাধবী দেবনাথ। সভায় বক্তব্য রাখেন দীপক চ্যাটার্জী, শিবেন সিনহা, বিপ্লব মৈত্র, অশোক পাল প্রমুখ। □

উত্তর ২৪ পরগনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী আন্দোলনের যৌথ মঞ্চের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ১৩ আগস্ট, '১৫ উত্তর ২৪ পরগনা জেলাশাসকের দপ্তরের সম্মুখে ২ সেপ্টেম্বর, '১৫ সর্বভারতীয় ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান কর্মসূচী প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে ব্যাপক সাফল্যের সাথেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভা পরিচালনা করেন সুভাষ চক্রবর্তী (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি), কাজল মজুমদার (এ বি টি এ), দুলাল পাল (এ বি পি টি এ), রঞ্জন চ্যাটার্জী (পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি) এবং বিশ্বজিৎ দাসশর্মা (পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন) কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভায় স্ট্রাইক নোটিশ উত্থাপন করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সম্পাদক পার্থ গোস্বামী। নোটিশের সমর্থনে বক্তব্য উত্থাপন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের পক্ষে তরুণ হালদার, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষে শ্রীকান্ত মুখার্জী, এ বি টি এ-র পক্ষে সুরঞ্জিত দেব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতির পক্ষে স্বপন কর্মকার এবং ১২ই জুলাই কমিটির জেলার অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক খগেন নাগ। সভায় স্ট্রাইক নোটিশটি সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হওয়ার পরবর্তী সময়ে নোটিশটি মাননীয়া জেলাশাসক, উত্তর ২৪ পরগনার কাছে প্রেরণ করা হয়। □

পূর্ব মেদিনীপুর

গত ১৩ আগস্ট, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ধর্মঘটের সমর্থনে জেলা শাসকের নিকট স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে অফিস ছুটির পর জেলা সদর তমলুক শহরে তিন শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের মিছিল শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসক দপ্তরের প্রধান গেটের সম্মুখে বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে স্ট্রাইক নোটিশটি পাঠ করেন পিনাকী অধিকারী, যুগ্ম সম্পাদক জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি, বক্তব্য রাখেন গোবিন্দ চক্রবর্তী জেলা সম্পাদক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, যুগল পাল নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, দ্বিজেন দাস নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, সোমনাথ সরকার জয়েন্ট কাউন্সিল, লীলা সী পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন, স্বপন রায় সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, নারায়ণ চন্দ্র বেরা বি পি টি এ, হিমাংশু শেখর মাইতি বি টি ই এ, গজেন মণ্ডল স্টিয়ারিং কমিটি, মুরারী ডোগরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়ন। জেলাশাসক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলাশাসক মহাশয়ের নিকট স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করেন গোবিন্দ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গঠিত প্রতিনিধিদল। সমগ্র সমাবেশটি পরিচালনা করেন অমর ভট্টাচার্য, অশোক দাশকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

ঐদিন জেলায় তিনটি মহকুমা শহরে যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে স্ট্রাইক প্রদান দিবস উপলক্ষে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি মহকুমাতে চার শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক মিছিল সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। □

নদীয়া

১৩ আগস্ট, '১৫ নোটিশ প্রদান কর্মসূচীতে নদীয়া জেলায় জেলা প্রশাসনিক ভবন প্রাঙ্গণে দেড় শতাধিক কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জমায়েত, স্লোগান ও দৃপ্ত মিছিলের মধ্য দিয়ে বেলা ২টোর সময় জেলাশাসকের নিকট ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করা হয়। একই সময়ে জেলার ২টি মহকুমা ও ১১টি ব্লকে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান উপলক্ষে ৩ শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে প্রস্তাব পাঠ ও বিক্ষোভের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়।

পরবর্তীতে ছুটির পর কৃষ্ণনগর পাত্রবাজার ট্রাফিক মোড়ে তিনশতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন জেলা যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক শঙ্কর ব্যানার্জী। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে দেবাশীষ ব্যানার্জী, যুক্ত কমিটির পক্ষে সুশান্ত মজুমদার, এ বি টি এ-এর পক্ষে রঞ্জিত মণ্ডল, জয়েন্ট কাউন্সিল-এর পক্ষে রাহুল মুখার্জী, এ বি পি টি এ-এর পক্ষে চূড়ামণি দাস বর্মন ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে তিমির বিশ্বাস।

সভার কাজ পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সভাপতি প্রদীপ বিশ্বাস, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি সুধন্য সরকার, যুক্ত কমিটির পক্ষে সৌরেন মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নের তপন বসু, জয়েন্ট কাউন্সিলের শঙ্কর ব্যানার্জীকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

কোচবিহার

২ সেপ্টেম্বর '১৫ রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চের আহ্বানে অনুষ্ঠিতব্য ধর্মঘটকে সামনে রেখে গত ১৩ আগস্ট জেলায় স্ট্রাইক নোটিশ ডে পালন করা হয়। কোচবিহার ডি এম অফিস চত্বরে স্ট্রাইক নোটিশ ডে পালন উপলক্ষে এদিন কর্মচারীদের ব্যাপক সমাবেশ হয়। স্ট্রাইক নোটিশ ডে'র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন জেলা যৌথমঞ্চের আহ্বায়ক ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক আশিস গোস্বামী। এছাড়া বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যুক্ত কমিটির ধীমান চক্রবর্তী, জয়েন্ট কাউন্সিলের পক্ষে প্রদীপ সরকার, এ বি টি এ-এর পক্ষে সুজিত দাস, এ বি পি টি-এর পুলক গুপ্ত প্রমুখ। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও প্রায় দুইশত কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) চিরঞ্জিৎ ঘোষ, স্ট্রাইক নোটিশ গ্রহণ করেন। ১৩ আগস্ট '১৫ সদরে বিক্ষোভ জমায়েতের পাশাপাশি চারটি মহকুমাতেই বিক্ষোভ-জমায়েতের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। মাথাভাঙা মহকুমাতে দুপুর ১.৩০ মিনিটে মহকুমা শাসক করণ চত্বরে বিক্ষোভ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। মাথাভাঙা মহকুমায় প্রায় ৭০ জন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মেখলিগঞ্জ, তুফানগঞ্জ ও দিনহাটা মহকুমাতেও বিক্ষোভ-জমায়েতের কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। এই তিনটি মহকুমাতে ছুটির পর কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। মেখলিগঞ্জ মহকুমায় ৪৫ জন, দিনহাটা মহকুমায় ৭৫ জন ও তুফানগঞ্জ মহকুমায় ৭২ জন কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। মহকুমার কর্মসূচীতে জেলায় অবস্থানরত রাজ্য সরকার পোষিত সংগঠনগুলিরও শ্রমিক-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। □

দার্জিলিং

গত ১৩ আগস্ট '১৫ শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংলগ্ন ময়দানে তিন শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে 'স্ট্রাইক নোটিশ ডে' প্রতিপালন করা হয়। উক্তদিনে দার্জিলিং জেলা সমাহর্তার নিকট ফ্যাক্স মারফত স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের নিকট যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়ে স্ট্রাইক নোটিশের কপি প্রদান করেন। বক্তব্য রাখেন যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক উত্তম চর্তুবেদী। □

২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ধর্মঘটের সমর্থনে

জেলায় জেলায় যৌথ কনভেনশন

দঃ ২৪ পরগনা

আসন্ন ২ সেপ্টেম্বর, '১৫ ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল করার লক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যৌথ মঞ্চের আহ্বানে গত ৩ আগস্ট '১৫ জেলা কনভেনশন বারুইপুর সরকারী কর্মচারী জেলা সংগঠন দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের আহ্বানে জেলা কনভেনশন থেকে ২ সেপ্টেম্বর, '১৫ ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করে তুলতে সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে ব্যাপক প্রচারের পাশাপাশি স্বৈরাচারী শাসকের বাধা আক্রমণকে উপেক্ষা করে ধর্মঘট সফল করে তোলার শপথ নিয়েছেন প্রতিনিধিরা। কনভেনশনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক তাপস বসু। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন এ বি পি টি এ-এর নেতা সুভাষ সরদার, এ বি টি এ-এর গৌতম ব্যানার্জী, কলেজকর্মী ইউনিয়নের দীপক সিনহা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেনস ইউনিয়নের নেতা তিলক কানুনগো, যৌথ মঞ্চের কেন্দ্রীয় নেতা বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী।

সভা পরিচালনা করেন শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, বাসুদেব সাহা, প্রদ্যোৎ ঘোষ, বাবুল বসু। □

বাঁকুড়া

গত ২৯ জুলাই বাঁকুড়া সমিতি ভবনে সন্ধ্যা ৬টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ, বাঁকুড়া জেলার আহ্বানে কর্মচারী সমাবেশে ও কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সমাবেশে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, এ বি টি এ, এ বি পি টি এ, জয়েন্ট কাউন্সিল, যুক্ত কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন, অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়াকার্সম্যান ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি, সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন যুক্ত মঞ্চের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লিটন পান্ডে (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি), জীবন সাহা (সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন), সুনির্মল দাস (পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন)।

প্রস্তাব উত্থাপন করেন তপন চক্রবর্তী, যুগ্ম সম্পাদক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। বক্তারা বর্তমান পরিস্থিতি ও আগামী ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ৯ দফা জরুরি দাবিতে ধর্মঘটের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাকে সফল করে তোলার আবেদন জানান।

কনভেনশনে আড়াই শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। □

হাওড়া

গত ২৯ জুলাই '১৫ যৌথ মঞ্চের আহ্বানে হাওড়া যোগেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ে হাওড়া জেলা কনভেনশন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কনভেনশন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে গত ২৯ জুলাই '১৫ জেলা দপ্তরে হাওড়া জেলায় অবস্থানরত বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে সভা হয় এবং জেলার ওয়ার্কিং টীম গঠন করা হয়। হাওড়া জেলাতে মোট ১৪টি সংগঠনকে যুক্ত করে ওয়ার্কিং টীম গঠন করা হয়েছে এবং অসিত দাস ওয়ার্কিং টীমের আহ্বায়ক হয়েছেন। গত ২৯ জুলাই '১৫ জেলা কনভেনশনে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা কনভেনশনে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল আড়াই শতাধিক। উক্তদিন হাওড়া জেলাতে সারাদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকা সত্ত্বেও কনভেনশনে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল আশাপ্রদ। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি ও যৌথ মঞ্চের ২ জন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত কনভেশনের কাজ পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির দীপালি পোড়েল, জয়েন্ট কাউন্সিলের ঝুমুর মান্না, এ বি পি টি-এর সারদা নন্দ শর্মা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়নের অশোক দলপতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ ওয়ার্কমেন্স ইউনিয়নের স্বপনকান্তি বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতির আব্দুল হাফিজ মোল্লা, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘের সুনীল কুমার পাত্র এবং এবিটিএ-র পক্ষে রতন কোলেকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

সভার প্রারম্ভে নয় দফা দাবি সংবলিত মূল প্রস্তাব উত্থাপন করে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির হাওড়া জেলা সম্পাদক অসিত দাস। তারপর প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন এ আই টি ইউ সি-র পক্ষে কুবের সিং, সি আই টি ইউ-এর পক্ষে সমীর সাহা, টি ইউ সি সি-র পক্ষে শ্যামসুন্দর হাজরা, যৌথ মঞ্চের পক্ষে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি রাধাগোবিন্দ দত্ত এবং বিজলী মিত্র। প্রত্যেক বক্তাই আগামী ২ সেপ্টেম্বর-এর ধর্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করার লক্ষ্যে নয় দফা দাবির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সর্বস্তরে পৌঁছাবার আহ্বান জানান এবং ১৩ আগস্ট স্ট্রাইক নোটিশ প্রদানের দিনে কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে হাওড়া ফ্লাইওভারের নিচে ছুটির পর জমায়েত ও সমাবেশ সহ প্রচারধর্মী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সভার কাজ শেষ হয়। □

দক্ষিণ দিনাজপুর

গত ৭ আগস্ট, ২০১৫ বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে, ৪২৫-৪৩০ জনের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কনভেনশন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কনভেনশন পরিচালনা করেন কৃষ্ণা ঘোষ (রাজ্য কো-অর্ডিঃ কমিটি), কল্যাণ দাস (এ বি টি এ), কনক রায় (জয়েন্ট কাউন্সিল), মানস তোকদার (সারা বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি) ও অসীম বিশ্বাস (যুক্ত কমিটি) কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী।

কনভেনশন থেকে রাজ্যের কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিজস্ব ৯ দফা দাবিতে ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ রাজ্যে ধর্মঘট প্রতিপালনসহ সর্বভারতীয় ১২ দফা দাবিতে ঐ দিনের ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব পেশ করেন অমল পাহান (যুক্ত কমিটি) এবং কল্যাণ দাস (এ বি টি এ)। সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন অচিন্ত মণ্ডল (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি) এবং জয়ন্ত চক্রবর্তী (জয়েন্ট কাউন্সিল)। সব শেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বক্তব্য রাখেন বরুণ চক্রবর্তী।

কনভেনশন থেকে দৃঢ় ভাবে ঘোষণা করা হয় ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫, সর্বভারতীয় ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিজস্ব ৯ দফা দাবিতে ভয় ভীতি, প্রলোভনকে উপেক্ষা করে আইনগত অধিকার নিয়ে রাজ্যে ধর্মঘট পালন করা হবে।

কনভেনশন থেকে অচিন্ত মণ্ডল (জেলা সম্পাদক রাজ্য কো-অর্ডিঃ কমিটি, দক্ষিণ দিনাজপুর) কে আহ্বায়ক করে ১০ জনের একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়। আগামী ১৩ আগস্ট, ২০১৫, ছুটির পর মিছিল সমাবেশের মাধ্যমে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করার সিদ্ধান্ত হয় কনভেনশন থেকে। □

বর্ধমান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনের যৌথ মঞ্চ, বর্ধমান জেলার আহ্বানে ৩১ জুলাই, ২০১৫ বিকাল ৫.৩০ টায় জেলা কর্মচারী ভবনে, আগামী ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে তিন শতাধিক শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতিতে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন প্রণব আইচ, বলাই চন্দ্র সরকার ও আশীষ নন্দী। কনভেনশনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন বর্ধমান জেলা যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক বিশ্বনাথ দে। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বর্ধমান জেলা এ বি পি টি এ -র পক্ষে সুব্রত দাস। কেন্দ্রীয় যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন বেদব্যাস মুখার্জী ও সুমিত ভট্টাচার্য। □

(অন্যান্য জেলার কনভেনশন ও স্ট্রাইক নোটিশের রিপোর্ট পরবর্তী সংখ্যায়।)

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।